সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে

Vol. 27 | No. 1 | 1983

Check for updates

Volume	27
Issue	1
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	December 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v27i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v27i1.3
Pages	157-197
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

সুধীন্দ্রনাথের চোখে মানবজাতির জন্য সান্ত্বনার সম্ভাবনাও দুর্নিরীক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করেননি, এলিয়টের মতো, ধর্মবিশ্বাসে প্রত্যাবর্তনেই মোক্ষ ; ভাবেননি, মধ্যপর্যায়ের জীবনানন্দ দাশের মতো, প্রকৃতি সংলগ্নতাই অভীষ্ট লক্ষ্য ; গ্রহণ করেননি, বিষ্ণু দে'র মতো, সকল সমাধানে মার্কসবাদের পক্ষ। বস্তুতঃ কক্ষচ্যুত তিনি আজীবনই। ঘোষিত জড়বাদী কিন্তু অবশেষে নিরীশ্বর কি না সন্দেহ। ঈপ্সিত ক্ষণবাদী—তাঁর প্রণয়িনী 'ক্ষণিকা' ; কিন্তু চিত্ত রবীন্দ্রনাথের 'চিরন্তনীর' আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। তিনি এন্টি-রোমান্টিকতার অভিসারী কিন্তু পরিণামে গভীর রোমান্টিক। যথার্থ প্রতীকী নন তিনি মালার্মে কি ভালেরির মতো ; বরং ভেরেলিন ডাকেন তাঁকে, বাজাতে চান শব্দমন্ত্রে অসম্ভব অর্কেস্ট্রা। বাংলা ছন্দ ও মিলের সতর্ক-শাসনে থাকেন বলেই তাঁকে ধ্রুপদী ভাবা নিরর্থক। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের নিয়ন্ত্রিত দোলায় কিম্বা অক্ষরবৃত্তের প্রবহমানতায় তাঁর সমিল সঙ্গীত আধুনিক চৈতন্য ও শিল্পরীতির পরিশ্রমী সমন্বয়। বলেছেন শব্দমন্ত্র শিখেছেন মালার্মের কাছে, যদিও ঐ প্রসঙ্গে তাঁর প্রকৃত উত্তমর্ণ মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। শ্রমের সাদৃশ্যেও তিনি ঐ দুই পূর্বসূরীর নিকট-আত্মীয়। প্রভেদ এই যে, তাঁর তরী ভগ্ন, প্রায় মগ্ন, 'জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে' এবং তিনি ত্রিশঙ্কু :

...আমি বিংশ শতাব্দীর
সমানবয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।
কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে, তথা ভবিষ্যের
নিষেধে, অধুনা ত্রিশঙ্কু, এবং সে-খণ্ড বিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কি না জানি,
নাস্তিরই বিবর্তবাদ। এমনকি উপস্থিত হানি
সম্ভবত অবাস্তব স্খলিত সে-পদ্যের মতো,
যাতে রেণু, বেণু, কদাচ ধেনুও, মিলে, ক্রমাগত
অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে ;

এবং অলীক ভেবে, উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনাকে
যখন করেছি ত্যাগ, সেকালে স্বকপোলকল্পিত
সর্বনাশে হাহুতাশ অবৈধ ও সাফল্যবর্জিত ।।১

দার্শনিক-তত্ত্বের দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ নিজেকে ভেবেছেন বস্তুবাদী বলে কিন্তু কবিতায় নেপথ্য ধ্বনি তুলেছেন আদর্শবাদের। বস্তুতঃ আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভাষায় :

> He was as afraid of losing his faith in materialism as many religious people are of losing their faith in God. Perhaps it would be more correct to say that Sudhin loved to be a materialist rather than that he was a materialist ... But Sudhin is hurt by the material world by the fact that it is material, that statistical laws of quantam physics and the tension equation of field physics reign supreme in the universe. The most striking note in his poetry is the feeling of deep mental hurt at the cosmos understood in terms of his materialistic philosohy.২

বলাবাহুল্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রথমাবধি ঐ পরিণতি বা তাত্ত্বিক সংকটে উপনীত নন। জীবনানন্দের মত তাঁরও একটা ক্রমবৃদ্ধি আছে এবং তিনিও বাংলা কবিতার ঐতিহ্যধারার সংগে সুস্পষ্ট সংযুক্ত। প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ থেকে তার উৎসারণ।

ডক্টর জগদীশ ভট্টাচার্য সুধীন্দ্রনাথকে 'প্রমথ চৌধুরীর পর বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে অভিজাত পুরুষ' বলে অভিহিত করেছেন এবং সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন অমিত রায়ের কথা : "বাংলা সাহিত্যে উভয়ের আবির্ভাব প্রায় সমকালীন। মনে হয় অমিত রায়েরই কবিসত্তা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।"৩ বলাবাহুল্য উভয় প্রসঙ্গই আংশিক সত্য কিনা সন্দেহ। মনীষাকে যদি আভিজাত্য বলা যায় তবে হয়ত প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে এই তুলনার অর্থ হয়। কিন্তু জগদীশ ভট্টাচার্য জাগতিক অর্থে ভেবেছেন ; তাই একই প্রবন্ধে সংশোধন করেছেন নিজেকে : "বাংলা সাহিত্যে সবুজপত্র সম্পাদকের আসন যে-পংক্তিতে সেই পংক্তিতেই পরিচয় সম্পাদকের স্থান। পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেও উভয়েই অভিজাত বংশীয়। প্রমথ চৌধুরী কৃষ্ণনাগরিক কুলীন, সুধীন্দ্রনাথ মহানাগরিক অভিজাত। কিন্তু মধ্যজীবনে জীবিকান্বেষণে সুধীন্দ্রনাথ আভিজাত্য ভ্রষ্ট হয়েছেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ইনশিওরেন্স কোম্পানি, এ. আর. পি., দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকতা এবং একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রচারসচিবত্ব করে গোত্রভ্রষ্ট হয়েছেন। এভাবে ভৃতকজীবী হওয়া প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে অসম্ভব ছিল।" অর্থাৎ কবির কর্মজীবন ডক্টর ভট্টাচার্যের অপছন্দ। অন্যদিকে অমিত রায়ের প্রসঙ্গ সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের স্নেহ-সম্পর্কের সুপরিচয়জাত। যদিও, বলাবাহুল্য অমিত রায় রবীন্দ্রনাথই ; এবং সুধীন্দ্রনাথ অর্কেস্ট্রার পর স্বকণ্ঠ পেয়েছেন ; তার আগেও ছিলেন তিনি আত্মানুসন্ধানে অনলস। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের তর্কজাত "কুক্কুট" সুধীন্দ্রনাথের

প্রথম প্রকাশিত কবিতা। ১৯২৯-এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিদেশযাত্রা---জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ। পর বৎসর ১৯৩০-এ প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য 'তন্বী'। উৎসর্গপত্রে অপূর্ব উচ্চারণ: 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে / অর্ঘ্য / ঋণশোধের জন্য নয় ঋণস্বীকারের জন্য।' ভূমিকায় এই ঋণস্বীকারের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা :

> পরবর্তী কবিতাগুলোর উপরে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন---সব সময়ে গ্রন্থকারের সম্মতিক্রমে নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্র জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ ব'লে ধ'রে নেওয়া প্রায় নিরাপদ। তবু এই চুরির জন্যে আমি লজ্জিত নই, কেননা শুধু সুন্দরের মোহ যে-চোরকে পাপের পথে ডাকে, সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে। ওই লুণ্ঠিত সম্পদের একটা বিস্তারিত তালিকা এইখানে দিতে পারলে, হয়তো, মহাবিদ্যার অপবাদটা অনেকখানি লঘু হত। কিন্তু সে-লোভ পরিহার করছি, কারণ পাঠকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় আনাতোল ফ্রাঁসের উপদেশ উল্লেখযোগ্য। তিনি একবার এক কবিযশঃপ্রার্থীকে বলেছিলেন, "পূর্বগামীর ঋণ কখনও স্বীকার কোরো না। সে-কৌশলে অধর্মের বোঝা তো তিলমাত্র কমবেই না, বরং হারাবে পাঠকের দরদ। পণ্ডিত ভাববে, তুমি করছ তার অখিল বিদ্যার প্রতি কটাক্ষ; মূর্খের মনে হবে তার অজ্ঞতা আর তোমার কাছে ঢাকা রইল না।" উপরন্তু আমার অনুতাপে পাঠকের কোনও দাবি নেই, তাতে যাঁর অধিকার, তাঁর ক্ষমায় কিছুতেই বঞ্চিত হব না। (কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩২৭)

১৯৩০ সালের ২৮ জুলাই তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'তন্বী' প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথকে লেখেন :

> আমার কাছে ঋণ স্বীকার করে আজকের দিনের বাংলাদেশে তুমি অসামান্যতা দেখিয়েচ। একেবারেই সাহস করতে না যদি ঋণটা বাহিরের জিনিষ না হত। কাব্যে তোমার একান্ত স্বকীয়তা আর সমস্ত কিছুকে অতিক্রম ক'রে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বুঝেছেন সুধীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রানুকরণের লক্ষ্য প্রকরণ, বক্তব্য নয়। প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথের আর একটি সদ্‌গুণ সুধীন্দ্রনাথ অনুকরণ করেছেন—সেটি কালচেতনা। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বিশ্বাস করেছেন প্রতিটি সাহিত্যকর্ম কালচিহ্নিত; তাই প্রত্যেকটি লেখায় তারিখ দিয়েছেন সচেতন ভাবে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগে এই সতর্কতা দেখিনা এবং রবীন্দ্রনাথের পর সুধীন্দ্রনাথ ব্যতীত এই চেতনা বিরল।

তন্বীর কবিতাগুলোর রচনাকাল ২৩শে অক্টোবর ১৯২৪ থেকে ৯ই মার্চ ১৯৩০। কবির ২৯ বৎসর বয়সে প্রকাশিত এই কাব্যের কবিতা সংখ্যাও ২৯। ১৯২৪ সালের

১টা, ১৯২৫-এর ১০টা, ১৯২৬-এর ১৩টা, ১৯২৭-এর ৩টা, ১৯৩০-এর ১টা এবং তারিখবিহীন ১টা।

১৯২৪ সালের একমাত্র কবিতাটির রচনা-তারিখ ২৩ অক্টোবর। জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই লক্ষ্য করেছেন 'একান্ত ব্যক্তিগত এই কবিতার মধ্যে একটি অলিখিত ইতিহাস লুকিয়ে আছে।' কবির প্রথমা পত্নী 'অলোকসামান্যা সুন্দরী' ছবি বসুর সঙ্গে বিবাহের তারিখ ২২ জুলাই ১৯২৪। তার ঠিক তিন মাস পরে লেখা এই কবিতা 'স্বপ্নভঙ্গের' প্রতিধ্বনি :

দেবী ভেবেছিনু আমি যে তোমারে,
না-ও যদি তুমি দেবতা হও,
মানবী হয়েই থাকো চিরকাল,
প্রণয়িনী হয়ে হৃদয়ে রও।
… … …
পুণ্য ও পাপ মিছে পরিতাপ,
ব্যর্থ ধর্ম কর্ম নীতি ;
সময়-অনলে সব যায় জ্ব'লে
কুলকলঙ্ক দোষের স্মৃতি।
দেশ কাল তব ছিল প্রতিকূল,
হয়তো বা তাই ঘটেছিল ভুল ;
সুযোগ আসেনি, চরণ খসেনি,
তাই আমি সাধু, তাই তো কৃতী।
প্রলোভনে তুমি পরাজিত হয়ে,
শিখে নিলে তার জয়ের রীতি ॥
… … …
দেবী ব'লে যবে ভাবিনু তোমারে,
ছিনু তোমা হতে সুদূরে অতি।
ভালো ক'রে আজ চিনেছি তোমায়,
মানবী হইতে কিসের ক্ষতি ?
আজি আসিয়াছ অহমিকাহারা,
নয়নের কোণে অনুতাপধারা ;
দেবী নহ আজ, প্রেমভিখারিনী
সম্ভ্রমহীনা বিগতজ্যোতি ;
মমতার টানে টেনেছ আমারে,
আজি আমি সখা, নহি তো পতি ॥

("মানবী", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩৬৯-৭১)

লক্ষণীয় কবিতার নাম "মানবী" এবং শেষ দুই চরণে কবিকণ্ঠ বাস্তবস্পর্শী আশাবাদী। সর্বোপরি 'ভেবেছিনু', 'ভাবিনু', 'ছিনু'— এই ধরনের প্রয়োগ বাদ দিলে কবিতার রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত। প্রথম স্তবকে দেবী এবং দেবতা বদলযোগ্য শব্দে পরিণত হয়েছে— এটা তরুণ কবির মাত্রাবিন্যাসে অসহায়তার দ্যোতক। ৯ ফেব্রুআরি ১৯২৫-এ লেখা 'অতন্দ্রায়' কবিতায় কবির ব্যক্তিগত বিষাদ : প্রথম একাকিত্বের উপলব্ধি :

আমিই একেলা শুধু অতন্দ্রার শয়নীয়ে শুয়ে,
ক্লান্ত শির থুয়ে
ব্যর্থতাকণ্টকক্লিষ্ট তপ্ত উপাধানে,
চেয়ে আছি শূন্যতার পানে ॥
("অতন্দ্রায়", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩৪৮)

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ পুনরায় মুখ্য হয়েছে "অনাহূত" এবং "বাৎসরিক" কবিতায়। দুটি তারিখ স্মর্তব্য। কবির বিয়ের তারিখ ২২ জুলাই ১৯২৪। দশমাস পর ১৯২৫ সালের মে মাসে 'একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। জন্মমুহূর্তেই শিশুটির মৃত্যু ঘটে।'[৪] ঐ মৃত পুত্রকেই যেন "অনাহূত" কবিতায় কবি সম্বোধন করছেন :[৫]

মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! কে বলে রে হবে পুনরায়
তোর সনে দেখা?
পলকের প্রণোদনা, থাক তুই আধোবিস্মরণে
চিরকাল লেখা,
নামহীন, কীর্তিহীন, সম্ভাবনা অপূর্ব মহান্,
স্খলিত সুযোগ,
অগীত সংগীত শ্রেষ্ঠ, আজন্মের পরাস্ত সাধনা,
বিরাট্ উদ্যোগ।
("অনাহূত", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩৫৩)

পরের মাসে ২৩ জুলাই ১৯২৫ কবির প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী। এই উপলক্ষে ঐদিনে লেখা 'বাৎসরিক"। ডক্টর জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই লক্ষ্য করেছেন, "মৃতবৎসা বনিতার উদ্দেশ্যে রচিত এই কবিতাটি আত্মরতিপরায়ণ শিল্পী-মানসের প্রীতিলেশহীন চরম নির্মমতারই সাক্ষী, অমানবিকতায় অসংবৃত।"[৬]

আজি তব তনু লাগে গুরু ভার
আমার কাছে;
শমিতবহ্নি পরশে তোমার
শিরায় শোণিত আর না নাচে।

আজি নিরর্থ প্রণয়ের ভাষ,
সে যেন ছলনা, মিছে পরিহাস;
শুষ্ক তোমার নয়ন উদাস
নীরবে ক্ষান্তি যাচে।
দুর্দম প্রীতি আজি শুধু স্মৃতি
মোদের কাছে ॥

... ...

মিছে প্রাণপণ, স্খলিত লগন
ফিরেছে কবে ?
আজিকে প্রণয় মিছে অভিনয়,
পুরানো কাহিনী তুলে কি হবে ?
ডাকে না মোদের অজানার বাঁশী;
ফুলহীন মালা সুকঠিন ফাঁসি;
দুয়ারে বিকট প্রদোষের হাসি;
শুকতারা নিবে নভে;
থেমে আসে গান; নিমীল নয়ান;
ঘুমাও তবে ॥
("বাৎসরিক", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩৩৭-৩৮)

বলাবাহুল্য এখানে রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত। এ-কবিতা প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্য পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যের পরও যে সুধীন্দ্রনাথকে 'বিবেকবান' ও 'সত্যনিষ্ঠ' বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন সে-নিতান্তই অদ্ভুত। সন্তানহারা মায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এ-কবিতা তুলনা-হীন নিষ্ঠুরতায় চিহ্নিত। হয়তবা এন্টি-রোমান্টিকতার চূড়ান্ত, অবশ্য ভাষা ও ছন্দের গীতলতা বিপরীতাভাস সৃষ্টি করেছে।

১৯২৫-এর ২০শে জুলাই লেখা "বর্ষার দিনে" কবিতায় এক অজানিত প্রেমাস্পদের প্রসঙ্গ; প্রকরণ রাবীন্দ্রিক, তবে উচ্চারণভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে বেজে উঠছে কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠস্বর:

"বলো, পাগল, বলো,
কোন্ নিঠুরায় ব্যর্থ ভালোবেসে,
চক্ষু ছলছল ?
কে সে চরম, কে সে পরম, যারে
সদাই তুমি চাও ?
কাহার পূজার আয়োজনের ভারে
আকুল হয়ে যাও ?

একলা ব'সে গোপন বিনিদ রাতে,
গাঁথো যে-গীতহার,
রাঙিয়ে কুসুম হৃদয়শোণিতপাতে,
কণ্ঠে দেবে কার ?"
(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩৩৪)

যথার্থ রাবীন্দ্রিক ধ্বনিদ্যোতনা ও চিত্রসৃষ্টি হয়েছে "পলাতকা" (৯ অগস্ট ১৯২৫) কবিতায় :

তুমিও সমুখে মম রয়েছ ব'সে :
শিহরিত তনু হতে আঁচল খসে.
শিথিল কবরী টুটি,
মুখে বুকে পড়ে লুটি,
আধোমুদা আঁখি দুটি মৃদু আলসে।
তুমিও সমুখে মম রয়েছ ব'সে ॥
(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩৩৯)

১৯২৬-এর ৬ই জানুআরি রচিত "অন্ধকার" কবিতায় 'বিনিদ্র' কবির চোখে যে **বিভীষিকা,** তা র‍্যাঁবোর নরকের সঙ্গে তুলনীয় :

বিনিদ্র শয়নে শুয়ে, চেয়ে দেখি স্তিমিত নয়নে,
যত বিভীষিকা থাকে অন্তরের নিষ্পান্থ অয়নে,
দুশ্চিন্তার ঘন বনে, দুঃস্বপ্নের অমা-অন্ধকারে,
তন্দ্রার প্রদোষালোকে, তৃষ্ণাদগ্ধ প্রলাপে বিকারে ;
কক্ষের প্রাকারগাত্রে আজি তারা করে বিচরণ,
যত ব্যর্থ অপূর্ণতা অসংযম অমূর্ত স্মরণ ॥
(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩৪৯)

১৯২৬-এর ১৫ই মে কবি আর নবীন লেখক নন হয়ত তিনি ধারণ করেছেন কোন "নবীন লেখনী"। 'তন্বী'র প্রথম কবিতারূপে মুদ্রিত হবার ফলে অনেকেই কালানুক্রমিক প্রথম কবিতা বিবেচনা করে "নবীন লেখনী"-র আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। সেটা গ্রাহ্য নয়। তবে লক্ষণীয় এই কবিতায় উচ্চারিত সংশয় জীবনানন্দের তুলনীয় কাব্য-পংক্তিতে—"আমার মতন / আর নাই কেউ"[৭] — যে আত্মঘোষণা আছে এখানে তা অনুপস্থিত ; এখানে দ্বন্দ্বাভাষ :

ওরে অশান্ত নবীন পান্থ,
নেই কি জানা
অজ্ঞাত পথে খাদে পর্বতে
বিঘ্ন নানা ?

অশ্রুর নদী, শাসনের শিখা,
হিংসার বিষ, যশমরীচিকা,
ভুখারী দীনতা নির্ভরহৃতা
গগনচোর—
জ্বেলে দিবে সহমরণের চিতা
তোর ও মোর ॥
(কাব্যসংগ্রহ পৃ. ৩৩২)

অন্যদিকে "কৈফিয়ৎ" (২২ মার্চ ১৯২৬) কবিতার ভাবদৌর্বল্য ও রবীন্দ্র-চিন্তার বিষয় প্রতিধ্বনি[৮] কোনো ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেনা। কবির স্থির বিশ্বাস : তাঁর কবিতা কাব্যপ্রেমী, পণ্ডিত কাউকেই আন্দোলিত করবেনা :

সুদূর শতাব্দীশেষে, জানি আমি, কোনও সপ্তদশী
আমার পুঁথির পানে নতমুখে বাতায়নে বসি,
লবে না উদ্দীপ্ত করি ম্রিয়মাণ দিনান্তের কালি,
সমব্যথাপরিপ্লুত দীর্ঘ নেত্রে প্রেমদীপ জ্বালি।
মিলিবে পণ্ডিত যবে সারগর্ভ জ্ঞানবিনিময়ে
চমৎকৃত সভাগৃহে, করিবে বিতর্ক অর্থ ল'য়ে,
তখন এ-যুক্তিহীন অকারণ বেদনাব্যঞ্জনা
শুনাবে প্রলাপসম, ক্ষিপ্রতার প্রত্যক্ষ দ্যোতনা।
দাসের স্বাতন্ত্র্যস্বপ্ন জানি হবে উপহাস্য, সখী,
(কাব্যসংগ্রহ পৃ. ৩৭১)

'তন্বী' কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিতা "চিরন্তনী" চিন্তায়, বক্তব্যে ও প্রকরণে যথার্থ রবীন্দ্র-প্রতিধ্বনি। এই চিরন্তনী রবীন্দ্রনাথেরই এবং বস্তুতঃ অধরা :

তুমি এসেছিলে, প্রিয়ে, করপদ্মে করিয়া বহন,
সুধা আর বিষ ;
একাধারে নিমন্ত্রণ, বিরহের অক্ষম দহন,
শাপ ও আশিস ;
মিলনের প্রতিশ্রুতি, জীবনের ফেনিল মত্ততা
এক আঁখিকোণে,
প্রণয়ের অসমাপ্তি, মরণের নিঃসঙ্গ ব্যর্থতা
অপর নয়নে ॥
... ...
তব নিমন্ত্রণ সে কি লক্ষ্যহীন পথের আহ্বান ?
তোমার মিলন,

সে কি শুধু আমরণ অরূপের অন্তহীন ধ্যান,
চিরানুশীলন ?
... ...
মৃত্যুর আড়ালে যেথা ঝ'রে পড়ে নিত্যসুধাধারা
দুরাশাসঞ্চিতা,
নীরবে মোদের সেথা হবে না কি পরিচয় সারা,
হে অপরিচিতা ?
(কাব্যসংগ্রহ পৃ. ৩৭৬ ও ৩৮০)

এই 'অপরিচিতা', "পশ্চিমের ডাক" কবিতায় (১২ মে ১৯২৭) 'প্রিয়া প্রতীকী'রূপে আবির্ভূতা এবং রবীন্দ্রনাথের সিন্ধুপারের বিদেশিনী :

তবু তব নিমন্ত্রণ উপেক্ষিনু মূঢ়তার দাপে
মোর নষ্ট যৌবনের রোমাঞ্চিত স্বর্গীয় ফাগুনে,
হে প্রিয়া প্রতীচী, তাই আজি তব তীব্র অভিশাপে
অঙ্গার হতেছে হিয়া এ অকাল জরার আগুনে।
তাই কাটে মোর দিন অর্থহীন অশেষ খেলায়,
শঙ্কিত নির্জীবমনা ক্লীবেদের বাচাল মেলায়,
হীনের জঘন্য সখ্যে, মহতের দুঃসহ হেলায়,
সুচির অজ্ঞাতবাস আর কত বাকি গুণে গুণে ।।
(কাব্যসংগ্রহ পৃ. ৩৫৫)

লক্ষণীয় সুধীন্দ্রনাথের কানে "পশ্চিমের ডাক"ই প্রকৃত মুক্তির নিমন্ত্রণ-ধ্বনি এবং উদ্ধৃতাংশের শেষ চার চরণে স্ব-পরিবেশ অজ্ঞাতবাসরূপে বর্ণিত।

এই গ্রন্থের সূচনায় 'মুদ্রিত অনামিকা'[৯] বাস্তব ও কল্পলোকের কবি-প্রিয়ার বর্ণনা :

সে যে অনামিকা
অনিত্যা মৃন্ময়ী অল্পা, তবু তার রূপমরীচিকা
নিশ্ছায় অমিত শূন্য মরুভূমিমাঝে
অন্তিম সম্বলসম দিশাহারা নয়নে বিরাজে ।।
(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩২৯)

'তন্বী' প্রকাশের আগে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে "কাব্যতর্ক" ও "কুক্কুট" কবিতা রচনার সমকালে ১৯২৮ সালে (২৭ আষাঢ় ১৩৩৫) এক পত্রে সুধীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

কাব্যরূপের বাহন হল শব্দ, বাক্য। শব্দের মধ্যে ধ্বনি আছে, অর্থ আছে—কাব্যরূপে দুয়েরই প্রয়োজন।··· ইন্‌টেলেক্টের ইট সাজিয়ে তুমি যদি কাব্য-

রূপ গড়তে যাও তবে সেই সৃষ্টিতে প্রত্যেক ইঁট ঠিক আপন পরিমাণটির চেয়ে আর কিছু দিতে পারে না কিন্তু সজীব গাছে প্রত্যেক অংশই আপনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

'তন্বী'র সমকালে রচিত পাঁচটি কবিতা দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রা'য় নয়, তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ক্রন্দসী'তে সংকলিত হয়েছে; 'ক্রন্দসী'র অবশিষ্ট কবিতা 'অর্কেস্ট্রা'র সমকালেরই রচনা। ১৯২৮ সালের ঐ পাঁচটি কবিতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ "বাক্য" শীর্ষক সনেট (রচনাকাল: সেপ্টেম্বর ১৯২৮)। মিলবিন্যাস কখখক কখখক গঘগঘ ঙঙ। এই সনেটেই কবি প্রথম তাঁর বাক্য ও শব্দ সচেতনতার কথা বললেন। প্রথম চরণে—'আমার আনন্দ বাক্যে: অক্ষরের অপূর্ব ঝংকারে' 'রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত পত্রের প্রতিধ্বনি। ষষ্টকের প্রথম চতুষ্কে:

মূল্যহীন সোনা হয় তব স্পর্শে, হে শব্দ অপ্সরী;
দুরাপের মদগর্ব খর্ব করো পরশে নিষ্ক্রিয়;
তোমার অবেদ্য গানে অব্যক্তির সতর্ক প্রহরী
বিমুগ্ধ নিদ্রায় লোটে, মুক্তি পায় অনির্বচনীয়।।
(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১২৪)

এখানে প্রথম চরণ "মূল্যহীনেরে সোনা করিবার/পরশ পাথর হাতে আছে তার"—এই রবীন্দ্র-পংক্তির পুনর্লিখন। রবীন্দ্রনাথের চিঠির একই তারিখের এক চিঠিতে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখে জানান তাঁর কাব্যাদর্শ:

"জনসাধারণের রুচির প্রতি আমার অশ্রদ্ধা এত গভীর যে তাদের নিন্দা-প্রশংসায় আমি উদাসীন। আমার মনে হয় কাব্যের প্রধান অংশ lyricism নয় Intellectualism এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মীয়তার প্রকাশ। কাব্যে Intellectualism আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে। সেই চিন্তাই গরীয়ান যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নিজের অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছয়। যার মধ্যে শুধু গন্তব্যের আভাসটুকু আছে সে-চিন্তা অসংহত অপ্রয়োজনীয় ব্যঞ্জনার অনুপযুক্ত। কাব্য-জগতে চিন্তার স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হবেনা। কবিতা চিন্তার বাহক মাত্র, চালক নয়। কাজেই চিন্তার রাস্তা মোড়বহুল গতি আঁকা-বাঁকা, পটভূমিকা পরিবর্তনশীল। চিন্তা স্বভাবত চঞ্চল, তার ধর্ম চলা, কিন্তু তার গতির একটা বিশেষত্ব আছে। চতুরায়তনিক ব্যোমে স্ব-নিয়ন্ত্রিত বস্তুর মত চিন্তাও চলে চক্রাকারে। অর্থাৎ সে যতই ঘোরাফেরা করুক, এলোমেলো চলুক, অবশেষে তাকে যাত্রাস্থলে ফিরে আসতে হবেই। এতে যদি সে অক্ষম হয় তাহলে তাকে অনুসরণ করা নিষ্ফল, সে নশ্বর। সময় গুণে তার দীপ্তির ক্ষয় হতে পারে, আকারের বিকার ঘটতে পারে, কিন্তু মধ্যপথে যদি তার চিত্তচাঞ্চল্য আসে, কোনো সহযাত্রী যদি তার একাগ্রতার সংক্রান্তিবৃত্তের পূর্ণ

পরিক্রমায় অকৃতকার্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার জন্ম ব্যর্থ। সে নিজেও লাবভান হয়না, অন্যের ঐশ্বর্যও বাড়াতে পারেনা, বরং আপনার অস্বচ্ছছায়ায় সংগীর তেজ করে খর্ব। চিন্তার এই গুণ থেকেই গঠনের উৎপত্তি। গঠনের পরিচয় কবিতার পঙ্ক্তিবিশেষের মধ্যে না-ও পরিলক্ষিত হতে পারে; কিন্তু একটা কবিতাকে পুরোপুরি নিলে তার মধ্যে একটা বাঁধুনি থাকা উচিত। গঠন সাম্যবাদী : যে কবিতাগুলি গঠনের নিয়ম মেনে চলে, তাদের সকলের ভিতরেই একটা বিশিষ্ট ঐক্য আছে। এই ঐক্য আয়তিতে : জ্যোতির্লোকে যেমন একটা বাঁধাবাঁধি পরিমাপ আছে, কোনো তারাই যার চেয়ে বেশী বড় বা বেশী ছোট হতে পারেনা, তেমনি কাব্য-লোকেও একটা দৈর্ঘ্য-ক্ষুদ্রতার সীমানা থাকা বাঞ্ছনীয়। চিন্তার বাহন হতে হলে কবিতার যে ওজন থাকা আবশ্যক, দু-লাইনের জাপানী কবিতায় যেমন তার অভাব, অগণ্য স্পর্শসম্পন্ন নৈষধেও তথৈবচ।

আমার থিয়োরিটা মুখ্যত এই। এর থেকে গোটা কয়েক শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে। যথা অসাধারণ চিন্তার অভিব্যক্তিতে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার প্রশস্ত : কেননা এই ধরনের শব্দ মানব-মনের অলসগমনের প্রতিবন্ধক। শব্দবাধায় ঠোক্কর খেয়ে অনেকেই হয়তো ঘরে ফিরবে, কিন্তু তার পরেও যারা এগুবে, তারা অন্তত চলবে চোখ খুলে, কান মেলে প্রতি পদে অগ্র-পশ্চাৎ ঊর্ধ্ব-অধঃ দেখতে দেখতে। এইখানে অলঙ্কারের কথাও বলে নিই কেননা অলংকার চিন্তাকে পরিস্ফুট করবার বিশেষ সহায়। উপমানের সংগে উপমার এত নিবিড় সম্পর্ক যে প্রথমটি স্বভাব অন্তত আংশিকভাবেও দ্বিতীয়টির মধ্যে এসে পড়ে। কাজেই উপমার ভিতরেও একটা সামঞ্জস্য, একটা ন্যায়সংগতি না থাকলে মুস্কিল। কিন্তু তাই বলে উপমাগুলোকে গতানুগতিক হতে হবে এর কোনো মানে নেই। বরং উল্টোটাই ভালো। সত্যকে নূতন ভাবে দেখতে গিয়ে নূতন রূপকের দরকার হওয়া স্বাভাবিক। এই রূপকের অন্বেষণে কবিকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মন্থন করতে হতে পারে। শুধু পারিপার্শ্বিক প্রতীক দেখেই যে-কবি তুষ্ট, সে-কবি অলস। কবিকে ব্যাধের সংগে তুলনা করা যায়। ব্যাধের মতন কবিও একটা শিকারের পশ্চাদধাবন করতে করতে যদি তার চেয়ে বেশী কাম্য কোনো শিকার দেখে তো সে প্রথমটাকে যেতে দিয়ে শেষেরটাকে করে আক্রমণ। এই রকমের অনেক বাছাবাছির পরে মনের মতন প্রতীক মেলে। তখনই কবিতা পৌঁছয় পূর্ণের সমীপে। Simbolist কাব্যে এই জন্যই বোধ হয় উপমা ও উপমানের সম্পর্ক অনেক সময় প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়েনা। প্রতীক অন্বেষণের সমস্ত বৃত্তান্তটা পাঠকের সামনে উপস্থিত করার কোনো বাধ্যবাধকতা কবির নেই। পাঠকের দ্রষ্টব্য পরিণত ফলটি : সে যদি এই ফলের জন্মকাহিনী জানতে চায় তো বাকিটা কল্পনা করে নিতে পারে। কবিতার emotional content-এর কথা বলে বক্তব্য শেষ করব। যারা কবিতাকে ছুটির সাথী বলে ভাবে,

কবিতার প্রতি ছত্র পড়ে হৃৎকম্পন অনুভব করতে চায়, তাদের কবিতা না-পড়াই উচিত। কবিতার গঠন যেমন প্রত্যেক লাইন বিশ্লেষণ করেও ধরা যায় না, তার ভাবাবেশও তেমনি খণ্ডাকারে দেখা যায় না, বিরাজমান থাকে সমগ্রের মধ্যে। ভাব শুধু মেঘ বাঁশী প্রিয়া বিরহ মিলন ইত্যাদি জরাজীর্ণ শব্দের করতলগত নয়, শুধু প্রেম বেদনা ও প্রকৃতিকে নিয়েই কাব্যের কারবার চলে না, তার লোলুপ হাত দর্শন-বিজ্ঞানের দিকেও আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছে। আজকের এই "বিশেষ জ্ঞানে"র দিনে কাব্যের তরফ থেকে আমি পাঠকের কাছে সেই নিবিষ্ট অনুশীলন ভিক্ষা করি, যেটা, সাধারণত অর্পিত হয় অন্যান্য আর্টের প্রতি। ১০

বোঝা যাচ্ছে ফরাসী প্রতীকী কাব্যের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়েছিল তবে ১৮২৮ সালের এই পত্রের সমকালে বা পূর্বকালের তাঁর নিজের কোন কবিতায় প্রতীকী কাব্য-চৈতন্যের কোন সুস্পষ্ট ছাপ নেই। এবং পূর্বোদ্ধৃত "বাক্য" শীর্ষক কবিতায় মালার্মে অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথই প্রত্যক্ষগোচর।

এই যুগধর্মে দীক্ষাগ্রহণ আপন ক্ষেত্রে কিভাবে ঘটেছে তা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে লিখতে যেয়ে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করেছেন সুধীন্দ্রনাথ। তার কিছু কিছু অংশ এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য মনে করি :

১৯৩৯ রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ পরিচয় না জানলে, আধুনিকেরা নিজেদেরও চিনতে পারবে না। (কু. কা, পৃ. ১১)

রবীন্দ্রনাথ স্বাধিকার প্রমত্ত নন, বিশ্বমানবিক প্রাণসামগ্রিরই উত্তরাধিকারী। (ঐ পৃ. ৮)
রবীন্দ্রনাথ যদিও আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধের অন্যতম উদ্যোক্তা, তবু তাঁর কৃতিত্ব ঐকান্তিক আত্মোপলব্ধি ;

জড়বাদী পশ্চিম তাঁর বাণী শুনে অন্তর্দর্শনের মূল্য বোঝেনি, বরং প্রাচীন জড়-ভরতেরাই তাঁর মারফতে পাশ্চাত্ত্য অধ্যাত্মতত্ত্বের সন্ধান পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক কবিদের কি সম্পর্ক হওয়া উচিত তা বিশ্লেষণ করে অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

১৯৩৬ বংশের গুণে এবং তৎকালীন পৃথিবীর শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি-দর্শনে রবীন্দ্রনাথের প্রতীতি জন্মেছিল যে জগৎ আনন্দময় এবং চূর্ণ মর্ত্যসীমার উত্তরে দেবতার অপার মহিমা বিদ্যমান। কিন্তু দীর্ঘ জীবনের প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতেও তাঁর অপসিদ্ধান্ত একেবারে অপসারিত হয়নি ; ...

সন্দেহ হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বধর্মে নিধন শ্রেয় নয় বটে, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ ; এবং সেজন্যে তিনি বোঝেননি যে প্রাচ্য মায়াবাদে দৈনন্দিন দুঃখকষ্ট অব্যাখ্যাত ব'লেই সারা এশিয়া আজ অগত্যা বস্তুতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে। ...
(ঐ, পৃ. ৬৫)

তিনি মানেন না যে শুভাশুভের বিকল্প অনিবার্য ;···

উত্তরসামরিক মানুষের পথে এ-বিশ্বাসের ভাগ নেওয়া অসম্ভব ; এবং বাঙালী কবি যদি গতানুগতিকতার অপবাদ খণ্ডাতে চায়, তবে রবীন্দ্রনাথের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে তাকে দেখাতে হবে যে তিনি বাংলাদেশে বৃথাই জন্মাননি, জন্মে স্বজাতিকে স্বাবলম্বন শিখিয়েছেন।···

যুগধর্মে দীক্ষাগ্রহণ তার অবশ্য কর্তব্য।

সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রা'। প্রকাশকাল ১৯৩৫। মোট ২৫টি কবিতার ১১টি ১৯২৯, ৩টা ১৯৩০, ৭টা ১৯৩১, ৩টা ১৯৩২ এবং একটা ১৯৩৩-এ রচিত। 'তন্বী'র মতই কালক্রমানুযায়ী সাজানো হয়নি এবং সাজানোর মধ্যে ভাবগত কোন শৃঙ্খলাও নেই।

এই গ্রন্থের প্রেমের কবিতার প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্র-প্রভাব, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যের প্রভাবই মুখ্য। দার্শনিক যে-তাৎপর্যেই নিজেকে তিনি 'ক্ষণবাদী' বলে চিহ্নিত করুন না কেন, তাঁর কাব্যে প্রকাশিত ক্ষণবাদ রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যের চিন্তারই প্রলম্বন মাত্র। পার্থক্য এই, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কৌতুক মুখ্য ; সুধীন্দ্রনাথে কৌতুক অনুপস্থিত। তিনি স্পষ্টতঃই বলেন :

বিদায়ের লগ্নে আজ নিঃসংকোচে কব,
"হে মোর ক্ষণিকা,
তোমার অরূপ স্মৃতি, সে নহে শাশ্বত।
আগন্তুক শ্রাবণের বৈদ্যুতিক উল্লাসের মতো,
তীব্র প্রবর্তনা তব সাঙ্গ হোক সাশ্রু অন্ধকারে ;
অবেদ্য বিস্ময় তারে
ক'রে দিক অনির্বচনীয়॥"
("মূর্তিপূজা", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ২০)

এই ক্ষণিকার মধ্যে অবশ্য কবি দেখেন : "সপ্তসিন্ধুপরপারে মর্মরিত নারিকেল বনে,/ ফাল্গুনের আড়ম্বরশূন্য জাগরণে, / যেই চিরন্তনী / একদা জাগায়েছিল অলক্ষিত নূপুরের ধ্বনি/···মোর জন্ম-জন্মান্তের সেই অনামিকা / ফেলেছে তোমার নীল নয়নের আয়ত সায়রে/ আপনার প্রতিবিম্ব চপল খেলায়।" স্পষ্টতঃই কবির "চিরন্তনী" সপ্তসিন্ধু পরপারের ; তেমনি তার "ক্ষণিকা"ও নীলনয়না— অর্থাৎ উভয়েই বিদেশিনী ; রবীন্দ্রনাথ-কথিত "আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধুপারে····"। এই ক্ষণিকা-সম্ভোগেই কবির ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি ঘটে যায়। এবং ক্ষণিক-কামকেই প্রেম বলে তাঁর বিভ্রম জন্মে :

মোর ভালে
একদা যে এঁকেছিলে ইন্দ্রত্বের টীকা,
সংক্ষিপ্ত সুকৃতি-শেষে, স্বর্গ হতে বিদায়ের কালে
মনে রবে সে-কথা, ক্ষণিকা ॥
("কস্মৈ দেবায়", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৬)

এমনকি ক্ষণিক প্রেমের প্রভাবে শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধান থেকে নিরস্ত হবার প্রতিশ্রুতিও ক'ৰ উচচারণ করেন অনায়াসে :

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার :
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার ;
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে ॥
("হৈমন্তী", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১২)

যদিও অন্তরে ক্ষোভ আছে :

সামান্যাদের সোহাগ খরিদ করে
চিরন্তনীর অভাব মেটাতে হবে ?

অনায়াস তপস্যায় কবির ক্ষণিক ইন্দ্রত্বলাভ ঘটে। কিন্তু ক্ষণিকা যে বহুবল্লভা একথাই কবির কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় ; পরস্পর বিস্মৃতিও স্বাভাবিক মনে হয় :

ক্ষণিক ইন্দ্রত্ব লভি অনায়াস তপস্যার ফলে,
তোমার উরসস্বর্গে বিরাজিবে বহু মর্ত্যচর ;
যে-হস্ত নিবদ্ধ এবে মোর ভুজে প্রাণপণ বলে,
রচিবে বরণমাল্য বারংবার সে-নিষ্কম্প্র কর ॥
... ...
তোমারে ভুলিব আমি, তুমি মোরে ভুলিবে নিশ্চয় ;
মদনের চিতানলে অনঙ্গের হবে আবির্ভাব ;
হরিবে অসংখ্য অলি যৌবনের অমৃতসঞ্চয় ;
সর্বস্বান্ত মর্মে শুধু প'ড়ে রবে অবেদ্য অভাব ॥
("ভবিতব্য", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ২৬)

তবু অকস্মাৎ ক্ষণিকা নয়, ইন্দ্রত্বের ধ্রুব অধিকার সম্পর্কে কবি সচেতন হয়ে ওঠেন :

ঘুচে যায় ভয় ;
জানি, জানি বিধাতা নির্দয়
কোনও দিন পারিবে না অর্গলিতে সে-স্বর্গের দ্বার,
ইন্দ্রত্বের ধ্রুব অধিকার

তোমার প্রেমের স্মৃতি রচিয়াছে মোর লাগি যেথা,
অয়ি মহাশ্বেতা ॥

("মহাশ্বেতা", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩১)

এবং তৎক্ষণাৎ পটভূমি পরিবর্তিত হয় ; ক্ষণিকা রূপান্তরিত মহাশ্বেতায় এবং কবি স্বয়ং চঞ্চল-চিত্ত :

তোমারে যে কেন বাসি ভালো,
সে-সত্য জানার আগে মিলনের মুহূর্ত ফুরাল,
শুরু হল দীর্ঘায়িত বিচ্ছেদের রাতি।
হায়, স্বপ্নসাথী,
শুধায়ো না সে-প্রথম প্রণয়কাহিনী।
সে-দিন বিশেষ ক'রে একমাত্র তোমারে চাহিনি
সর্বনষ্ট মর্ত্যে বা ত্রিদিবে।

("অনুষঙ্গ", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ২৭)

পরিণামে ক্ষণিক প্রেমকেই "অন্তিমের অব্যয় পারানি" বলে মনে হচ্ছে :

জানি, আরও জানি
তোমার ক্ষণিক প্রেমই অন্তিমের অব্যয় পারানি ;
উপরন্তু ধরা,
তোমার উপমা ব'লে, মোর চক্ষে এখনও সুন্দরা ॥

(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ২৯)

—অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিত যাচ্ছে বদলে।

যথার্থই যে পট পরিবর্তিত হয়েছে তার অসামান্য কাব্যরূপ "শাশ্বতী"। এ-যাবৎ ঈপ্সিত ক্ষণবাদী দর্শন প্রকাশের জন্য তিনি যে পংক্তিমালা রচনা করেছেন, বক্তব্যগত দিক থেকে অংশত সে-সব রবীন্দ্র-রোমান্টিসিজমের বিপরীত। কিন্তু স্মর্তব্য, অনুরূপ বক্তব্য লঘুভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ এনেছিলেন 'ক্ষণিকা' কাব্যে, সে-কথা আগেই বলেছি। যেমন, "অতিবাদ" কবিতায় :

যদি বল আর বছরে
এই কথাটাই এমনি করে
বলেছিলি কিন্তু ওরে
　　শুনেছিল আর একজনে,
জেনো তবে মূঢ় মত্ত
আর বছরে সেটাই সত্য
এবারো সেই প্রাচীন তত্ত্ব
　　ফুটলো নবীন চোখের কোণে।[১১]

প্রেম শাশ্বত নয়, শাশ্বত নয় প্রেমের স্মৃতিও — রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' পর্যায়ের এই চিন্তায় সুধীন্দ্রনাথ এন্টি-রোমান্টিসিজমের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। পরেও পৌনঃপুনিক 'ক্ষণিকা'র প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ :

১৯৩৩ রবীন্দ্র-সাহিত্যের রত্নাকরেও এই মধ্যমণিটির জোড়া নেই।[১২]

১৯৪০ তাঁর ক্ষণস্থায়ী প্রতর্ক; প্রজ্ঞাপারমিত রূপ 'ক্ষণিকা'র অনুপম ঐশ্বর্য।[১৩]

স্মর্তব্য : সুধীন্দ্রনাথের পাশাপাশি ১৯২৯ সালে কবি বিষ্ণু দে-ও ''উর্বশী'' কবিতায় নিজেকে ক্ষণবাদী প্রেমিক রূপে উপস্থিত করেছেন :

আমি নহি পুররবা। হে উর্বশী
ক্ষণিকের মর অলকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, জানো গড়ে তুলি আমার ভুবন ?
এসো তুমি সে ভুবনে, কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে।
ক্ষণেক সেখানে থাকো,
তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণ বীথি
যে সময় নেই—শুধু তুমি থাকো ক্ষণকাল,
ক্ষণিকের আনন্দ আলোয় ···[১৪]

বিষ্ণু দে এই চৈতন্যে খুব বেশি দিন থাকেন নি। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ ঘুরেছেন পৌনঃপুনিক ক্ষণিকা-চিরন্তনী দোলাচলে। এবং ঐ-সব কবিতায় কবিভাষা ও ছন্দোভঙ্গি বিশেষ-ভাবে রবীন্দ্রানুসারী। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাষার অনুকরণের ফলেও এন্টি-রোমান্টি-সিজমের ভাব অপ্রকট থেকে গেছে। এই পর্যায়ের সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে প্রয়োগযোগ্য মনে হয় ভেরেলিনের কবিতা-প্রসঙ্গে উচচারিত ব্রেরেতঁ-র মন্তব্য :

an undergraduate mixture of sensuality and sentimentality written in a style of distressing flaffiness.[১৫]

অনতিবিলম্বে সুধীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা' থেকে 'শাশ্বতী'তে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই কবিতা গভীর রোমান্টিক ও প্রেমিক-কবি হিসেবে সুধীন্দ্রনাথকে যেমন প্রতিষ্ঠা করেছে, তেমনি এই কবিতাতেই প্রথম সুধীন্দ্রনাথ আপন ভাষা ও ছন্দ খুঁজে পেয়েছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রচলিত ৬/৬/৬/২ মাত্রাভাগের একটি পূর্ণপর্ব বর্জন করে ৬/৬/২ মাত্রাবিন্যাস এনে, প্রথম-তৃতীয় ও দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণে মিল দিয়ে, এবং প্রতিটি ১৬ চরণের তিনটি স্তবকে সমগ্র কবিতাটি সাজিয়ে কবি একই সঙ্গে কবিতাটির চরণে দ্রুতি, সঙ্গীতদোলা এবং নাট্যভঙ্গি সঞ্চার করেছেন। সন্দেহ নেই, 'শাশ্বতী' সুধীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং বাংলা ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা।

কবিতার প্রথম স্তবকে প্রকৃতির পরিবেশ প্রেমানুকূল :

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে,
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;
স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া ।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে ;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি :
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী ।
কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে ;
বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে ।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকী ;
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা :
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি ;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা ॥

দ্বিতীয় স্তবকে এই প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশে সহজিয়া অনুরাগের স্মৃতি প্রবলভাবে জাগছে :

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে ।

এবং সেই স্মৃতি মনে আসা মাত্রই সেই সময়ের প্রকৃতির প্রবলতা কবি-চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করছে :

সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে ;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে ।

উপমাগুলির অভিনবত্ব এবং চিত্রকল্পের বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় । তারপর কয়েকটি অসামান্য চরণ ; একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে কিন্তু পরিণামে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে আধুনিক বাংলা কবিতাকে এক স্বতন্ত্রভূমিতে এনে দাঁড় করিয়েছে :

একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ;

একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি ;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে ;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে ।।

তৃতীয় স্তবকে বর্তমানে পুনরায় ফিরে এসেছেন কবি। স্মৃতি-সঞ্চিত সহজিয়া অনুরাগ আর ক্ষণিক নয়, শাশ্বত প্রেমে রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষায় জেগে উঠছে :

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে :
অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে ;
মদমুকুলিত তারই দেহ সৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে।

এর পরবর্তী চরণসমূহ প্রবাদ-তুল্য অসামান্য উচ্চারণ :

ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে ;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি ;
স্বাতি মণিময় তারই প্রত্যভিষেকে।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম ;
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে ;
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম ;

এই গীতিময় পরিবেশে কবির জন্যে বাস্তব যা তা এক রূঢ় সংবাদ : নিতান্ত গদ্যাত্মক চরণে উচ্চারিত :

কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে।

যে-রমণীর প্রেমকে ক্ষণিক বলে কবি পৌনঃপুনিক জানিয়েছেন, বুঝিয়েছেন প্রেমের স্মৃতি শাশ্বত নয়—খুব স্বাভাবিক সে-রমণী যদি কবিকে বিস্মৃত হয়ে 'আর কারে ভালোবাসে'। কিন্তু কবির বাস্তব :

স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা :

এবং কবিতাটির উপসংহারে কবি হাহাকার করে উঠেন :

সে ভোলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না ।।

(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৫০-৫১)

এই আর্তনাদে যে আত্মসমর্পণ তাই সুধীন্দ্রনাথকে প্রেমিক ও রোমান্টিক হিসেবে সুচিহ্নিত করে।

ভেরেলিনের আর্ট পোয়েটিক মূলতঃ সঙ্গীত —'ছন্দ ভাষা সাহিত্যযুক্ত —অন্ততঃ কবির তাই প্রত্যাশা ছিল। ফরাসী ও ইংরেজী কবিতার তুলনা করে অডেন (১৯৬২) লিখেছিলেন :

> If French poets have been more prone than English to fall into the heresay of thinking that poetry ought to be as much like music as possible, one reason may be that in traditional French verse sound effects have always played as much more important role than they have in English verse. The English-speaking peoples have always felt that the difference between poetic speech and the conversational speech of everydays should be kept small, and whenever English poets have felt that the gap between poetic and ordinary speech was growing too wide, there has been a stylistic revolution to bring them closer again.
>
> In English verse, even in Shakespeares grandest rhetorical passages, the ear is always aware of its relation to everyday speech. A good actor must alas, today he too seldom does make the audience hear Shakespeare's lines as verse not prose, but if he tries to make the verse sound like a different language, he will make himself ridiculous.
>
> French poetry, both in the may it is written and the way it is recited, has emphasized and gloried in the difference between itself and ordinary speech; in French drama, verse and prose are different language. Valery quotes a contemporary description of Rachel's powers of declemation; in reciting, she could and did use a range of two octaves, from below middle C to F in alt. An actress who tried to do the same with Shakespeare as Rachel did with Racine would be laughed off the stage.

সাঁ জন পার্স অবশ্য বলেছেন সাধারণ কথাবার্তায় ফরাসী অনেক মনোটোনাস এবং ইংরেজী অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ।

সন্দেহ নেই বাংলা ভাষার সঙ্গে ফরাসী কবিতার, বিশেষতঃ স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের গীতলতার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। ভেরেলিনের সঙ্গীতই সর্বোত্তম এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন বাংলাভাষায় একটি অসামান্য "অর্কেস্ট্রা"—শব্দমন্ত্রে সিম্ফনী রচনার প্রয়াস। ১৯৩২ সালের ১১ই ফেব্রুআরি রচিত এই কবিতা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে ১৯৫৩ সালের ১লা আগস্ট লেখা ঐ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

··· 'অর্কেস্ট্রা'-অভিধেয় বহুরূপী লেখাটা, বাক্যের অহেযোগ সত্ত্বেও, কায়মনের সপ্তপদী, এবং তার সাত কাণ্ড যেমন গতিমূলক পরাকাষ্ঠার সোপানপরম্পরা, তেমনই প্রত্যেক পর্ব আবার ত্রিবিধ উপলব্ধির তাৎকালিক সমন্বয়। অর্থাৎ প্রতি ভাগে ঘুরে ঘুরে এসেছে রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য, শ্রাব্য ঐকতানের অতিশ্রুতি ব্যঞ্জনা, আর শ্রোতৃবিশেষের সমবায়ী ভাবানুষঙ্গ ; এবং সমগ্র কবিতার ত্রিবেণীতে এক দিনের সাত প্রহরব্যাপী অভিজ্ঞতাই কৈবল্যপ্রার্থী নয়, তাতে—সম্ভবত গ্রন্থের অন্যত্রও — বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরাত্মার, তথা লোকায়ত ও লোকোত্তরের, অবৈকল্যও অন্তত উহ্য আছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে মৌলিক ব্যবধান এই যে প্রাচ্য সঙ্গীত মূলতঃ একক সাধনামূলক মেলডি এবং পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত বিচিত্র স্বরের সমন্বয়, হারমনি—কি কণ্ঠ কি যন্ত্র উভয়তঃ এই ঐতিহ্যভেদ। "অর্কেস্ট্রা"য় পাশ্চাত্ত্যেরই প্রবর্তনা। কবিতাটি শুরু হয়েছে প্রেক্ষাগৃহে :

নিবে গেল দীপাবলী ; অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন
স্তব্ধ হল প্রেক্ষাগারে। অপনীত প্রচ্ছদের তলে,
বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী
নম্র কণ্ঠে মরমী আহ্বান ; জাগিল বিনম্র সুরে
কম্পিত উত্তর বেহালায় অচিরাৎ।···

যন্ত্রী নয় যন্ত্র এখানে ব্যক্তিত্ব লাভ করেছে। পাশ্চাত্ত্য অর্কেস্ট্রার শ্রোতা জানেন : সাধারণতঃ ব্যাঙ্গ (Bang) দিয়ে অর্কেস্ট্রা শুরু হয় ; অন্য কিছু ছাড়াও তা সবার মনোযোগ হঠাৎ ফেরাবার একটা উপায়ও বটে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের অর্কেস্ট্রা শুরু করছে 'নিঃসঙ্গ বাঁশরী'—প্রাচ্যের আবহ যেন, এবং তার উত্তর জাগছে বেহালায় : পাশ্চাত্ত্যের সুর। অর্কেস্ট্রা শুরু হতেই কবি লক্ষ্য করেছেন শ্রোতৃমণ্ডলীতে প্রতিক্রিয়া, পরদেশী সঙ্গীতের ঐকতান সমর্থনে যেন। প্রথম কাণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে অক্ষরবৃত্ত বদলে যাচ্ছে ৫/৫/২ চালের মাত্রাবৃত্তে। অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতে যে-তরঙ্গ তাই তিনি শব্দে ধরতে চাচ্ছেন :

অস্তাচলে চন্দ্র দিশাহারা ;
অতন্দ্রিত জোনাকি ম্রিয়মাণ ;
বিদায় মাগে মলিন শুকতারা ;
স্বপনলীলা হয়েছে অবসান ॥

প্রথম কাণ্ডের তৃতীয়াংশে ছন্দ আবার বদলে ৬/৬/২ রূপ নিচ্ছে :

রাত্রিশেষের দ্বিধাদুর্বল আলো
উঁকি মারে ওই খোলা জানালার ধারে ;
নির্বাণ দীপে ধূমকজ্জল কালো
মূর্ত করেছে ব্যর্থ প্রতীক্ষারে ॥

দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রথমে আবার বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ :

ফুকারিল রণতূর্য ; প্রতিধ্বনিপ্রভব দুন্দুভি
সাড়া দিল সমস্বরে ; চমৎকৃত সুষিরে সুষিরে
ভরিল বিপুল মন্দ্র ; তন্ত্রে তন্ত্রে হল বিনিময়
গমক, মূর্ছনা, মীড় ; লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য কিঙ্কিণী
অধীর আগ্রহ-ভরে বিতরিল দিকে দিগন্তরে
স্বর্ণপ্রভ কবোষ্ণ ঝংকার।···

দ্বিতীয় কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশে প্রথম দু'চরণে মন্দাক্রান্তা ৭/৬/৬/৫, তৃতীয়-চতুর্থ চরণে ত্রিপদী এবং পঞ্চম চরণে আবার প্রথম চরণের পুনরাবৃত্তি রচনা করছে গম্ভীর গীতধ্বনি :

সপ্ততুরগ রবি আগত সহসা উদয়শৈল শিখরান্তে :
শাপবিমোচিত বসুধা বন্দে তারণ চরণোপান্তে।
মলয় কমলরজ বরষে ; মধুকর মুখরে হরষে ;
মায়ামুকুরিত সরসে ছায়া নিরখে কান্তে।
সপ্ততুরগ রবি আগত সহসা উদয়শৈলশিখরান্তে ॥

দ্বিতীয় কাণ্ডের তৃতীয়াংশে ৬/৬/২ মাত্রাবৃত্ত ; দিনের আশিস এবং অমর প্রাণ এবং কত জনমের বঞ্চনা ব্যথা, তুমিই পরম শান্তি এই প্রেমোচ্ছল আকুতিকে প্রকাশ করছে :

ললাট তোমার দিনের আশিসে দীপ্র ;
নয়নে তোমার অমর প্রাণের লাস্য ;
নিঃশ্বাস তব প্রণব আবেগে ক্ষিপ্র ;
তুমি প্রসন্ন অধরার স্মিত হাস্য ॥

·· ·· ··

কত জনমের বঞ্চনাব্যথা মত্ত
পেয়েছে তোমার তিনটি কথায় ক্ষান্তি।
অলীক স্বপন—তুমিই নিপট সত্য ;
চলচঞ্চলা—তুমিই পরম শান্তি ॥

তৃতীয় কাণ্ডের প্রথমাংশে আবার বাদ্য-যন্ত্রের নাটকীয় সংলাপ বিনিময় :

নীরব সকল যন্ত্র ; ক্লান্তিহীন বেহালা কেবল
ফিরিল সপ্তকরথে সমধর্মী সুহৃৎ-সন্ধানে
গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। টুটিল হঠাৎ সনির্বন্ধ
অনুনয়ে তার শরমের সংকোচন নির্বচন
পিয়ানোর বুকে ; সঞ্চালিত কড়ি ও কোমলে দ্রব
সুর উদ্বেল, উচ্ছল হল ; অতিমর্ত্য অনুনাদে
ভ'রে গেল সংগীতের শূন্য অবকাশ।···

এই পর্যায়ে দর্শক-সারিতে কবির পাশে উপবিষ্টা বিদেশিনী 'অহৈতুক সোহাগে' 'স্থাপিল অধীর পাণি দয়িতের চমৎকৃত ভুজে' এবং 'পরশিল আমারে উত্তরী তার'।

দ্বিতীয়াংশে ৭/৭ মাত্রার দোলায় প্রলম্বিত সুর

দখিন বায়ু আসি নির্ঝরিণীকানে
ভনিল কোন্ কথা, তা শুধু সেই জানে।
সহসা সে-সুমনা হয়েছে বিবসনা,
অশীল নটীপনা জেগেছে প্রাণে প্রাণে।
কহিল সমীরণ কী কথা কানে কানে ?

এবং তৃতীয়াংশে ৪/৪ এর দ্রুততা :

ছায়াবীথি মোহে ঢাকা,
সোনা-খচা পথখানি,
ফুলে অবনত শাখা
গুঞ্জরে বনবাণী ।।
জানি আছ সে-রহসে,
তবু খুঁজি দিশাহারা—
অগোচর তামরসে
অলি বুঝি মাতোয়ারা ।।

চতুর্থ কাণ্ডের প্রথমাংশে পুনরায় যন্ত্র-সংলাপ :

আবার সকল তূরী, সমস্ত বিয়াণ আরম্ভিল
সমস্বরে কাংস্য কোলাহল ; অভ্রভেদী রুদ্রবীণা
ঝংকারিল সমুচ্চ সপ্তমে ; মহীয়ান্ অর্গানের
সাগরসংগীতে পিয়ানোর স্নিগ্ধ কণ্ঠ ডুবে গেল
ক্ষীণতোয়া তটিনীর মতো। ত্রিভুবন পরিপ্লুত
হল তানে, তালে, সুরসমন্বয়ে ; রহিল না কোনও
ছিদ্র, নিবৃত্তি, বিরাম।···

দর্শক সারিতে কবি দেখছেন 'পার্শ্ববর্তী যুবতীর' নীল চোখে আলো-স্পন্দন।

দ্বিতীয়াংশে ৮/৬ পয়ারের চালে তৃতীয় চরণে ৮ / ৮ এবং তৃতীয়-চতুর্থ চরণ মিলে ত্রিপদীর বৈচিত্র্য :

কখন হয়েছে মূক / পাখীর গীতা ;
অকপট সমারোহে / বচন বৃথা।
শোনো মৌনের তলে / বিধাতা অবাধে চলে,
আঁকিয়া অলখ হলে / প্রাণের সীতা !
অকপট সমারোহে / বচন বৃথা ।।

তৃতীয়াংশের সুরের ইন্দ্রজালে ঘটছে নিত্য বর্তমানের আবির্ভাব :

হিরণ নদীর বিজন উপকূলে
আচম্বিতে পথের অবসান ;
তপোবনে কল্পতরুর মূলে
আবির্ভূত নিত্য বর্তমান ॥

এবং সেই পরিবেশে সৃষ্টির প্রথম ও শেষ যুগলরূপে স্থান বিজনে 'তুমি আমি'র অনুভব :

শূন্যে হঠাৎ লুপ্ত বসুন্ধরা ;
ত্রিভুবনে কেবল তুমি-আমি :
সৃজনপ্রাতের প্রথম যমক মোরা,
প্রলয়রাতের শেষ বনিতা-স্বামী ॥

পঞ্চম কাণ্ডে ডমরু ডঙ্কায় বেজে উঠছে প্রলয়-নিনাদ, 'মূর্ত মৃত্যু নৃশংস নির্দেশ' :

সহসা ডম্বরু, ডঙ্কা বজ্রকণ্ঠে উঠিল হুংকারি ;
ক্ষণে ক্ষণে কর্কশ ঝঞ্ঝনা ঝংকারিল করতালে
বিপরীত সুরে ; রহি রহি নিবদ্ধ তন্ত্রের 'পরে
বিচরিল অসংগত সুরের ঝলক ; তীব্র বাঁশি,
বিদীর্ণ কীচক-সম, প্রচারিল প্রলয়ের ক্ষতি
অরুন্তুদ হাহাকারে ; অর্গানের সান্তর গর্জনে
বাসুকির নাভিশ্বাস শ্রুতিগম্য হল অচিরাৎ ;
পিয়ানোর ক্ষিপ্ত আস্ফালনে উচচারিল মূর্ত মৃত্যু
নৃশংস নির্দেশ ।

এই কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশে তাই কবি আনছেন ভয়াল, সৃষ্টিধ্বংসী শিব-নৃত্যের রুতি :

আজ মহেশ মেলেছে বিলোচন,
পায়ে তাণ্ডব জেগে উঠেছে ;
হল বিন্ধ্যের শাপবিমোচন,
পুন সৌরলোকে সে ছুটেছে ।
বুঝি উদ্‌ঘাট দ্বার নরকের ;
যত তৃষিত পিশাচ মড়কের,
তারা মেতেছে গাজনে চড়কের ;
সারা বিশ্বের স্থিতি টুটেছে ।
ওই রসাতলে যায় ত্রিভুবন ;
আজ প্রলয়েশ জেগে উঠেছে ॥

তৃতীয়াংশে 'তুমি আমি'তে ফিরে যেয়ে সেই প্রাচীন প্রশ্ন কবির কণ্ঠে বেজে উঠছে, তিনিই কি তার প্রথম প্রেমিক :

খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেম, "তোমার প্রেমে
নই কি আমি প্রথম আগন্তুক ?"
অবাক বিষাদ এল তোমার চক্ষে নেমে ;
রক্তে ভাঁটা, ফিরিয়ে নিলে মুখ ।।

বলতে গিয়ে, আটকে গেল আত্মকথা ;
করুণ কাঁপন লাগল ওষ্ঠাধরে ;
আচম্বিতে সংকুচিত তনুলতা,
লুকাল না লজ্জা দিগম্বরে ।।

কবিই প্রথম প্রেমিক নন, এই সত্য কবিকে নিক্ষেপ করছে 'আদিম অন্ধকারে' এবং :

একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের পরে ;
সামনে মরু অস্থিসমাকুল ।
মৃত্যু স্বয়ং বিস্মরিল আজকে মোরে ;
অস্তমিত বিধির আমি ভুল ।।

ষষ্ঠ কাণ্ডে সুতরাং সব নিস্তব্ধ। ধ্বংসের পর আবার প্রাচ্য সুর ; মুরলীতে বেজে উঠছে পূরবী। সঙ্গে সারেঙ্গী। এবং অবশেষে পাশ্চাত্ত্য পিয়ানোর মুখে সঞ্জীবনী সুধা পড়ছে ;

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ সকলই । তার পর আর বার
মোহন মুরলী কী অপূর্ব পূরবীর মোহময়
সুরের আবেশে তুলিল রণিত করি সীমাশূন্য
শূন্যতার হিয়া ; সারেঙ্গীর রলরোল বিলম্বিত
তালে সমাচ্ছন্ন পিয়ানোর মুখে সিঞ্চিল পরম
যত্নে সঞ্জীবনী সুধা ;

দ্বিতীয়াংশের শেষে মর্ত্যমহিমা যে এখনো অস্ত যায়নি এই বিশ্বাস ফিরে আসছে :

অভয় নিশার দক্ষিণ হাতে উদ্ধৃত,
সপ্ত প্রদীপ ম্রিয়মাণ বাম হস্তে ;
যদিও দিনের ভাস্বর আঁখি মুদ্রিত,
মর্ত্যমহিমা যায় নাই তবু অস্তে ।।

এবং সেই সঙ্গে ফিরে আসছে 'তুমি'

স্বর্ণভারে তোমার মাথা লুটিছে মম উরুতে ;
নিবিড় নীল নয়ন-কোণে সজল স্মৃতি অঙ্কিত ;
অতীত ব্যথা—কেবল তার ত্রিবলি তব ভুরুতে ;
হরিণীসম, কম্প্র তনু অহেতু ভয়ে শঙ্কিত ।।

এই 'তুমি'ই কবির কাঙ্ক্ষিত চির-মানবী চির-পরিত্রাণ—অযোগ্যের অবগাহনে যে ম্লান নয়; লাঞ্ছিত নয়—সে অরুণা :

চিনেছি চির মানবী তুমি; পাবন তব করুণা,
অযোগ্যের অবগাহনে হয় না ম্লান, লাঞ্ছিত;
প্রথম ঠাঁই পাইনি তাই তোমার প্রেমে, অরুণা;
প্রত্যাগত মাধবে আজি তাই কি আমি বাঞ্ছিত?

সপ্তম কাণ্ডে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যন্ত্র সমবায়ের অসামান্য সুর-সমন্বয় হচ্ছে :

উদাত্ত বিষাণ উৎসরিল উর্ধ্বগ আহ্বান; মুগ্ধ
বেণু, দীর্ঘায়িত মিনতির সুরসূত্র টানি, বেঁধে
দিল রন্ধ্রে সংযোগের রাখি; আবিষ্ট মূর্ছনা,
উদ্বেল অন্তর হতে, উত্তরিল বেহালার তারে;
ত্রিপথগা সুরধুনী, অর্গানের শঙ্খনাদে জেগে,
চরাচর ডুবাল উর্বর মোক্ষে।...

দ্বিতীয়াংশে তাই ফিরে আসছে মন্দাক্রান্তা, সনাতন রাত্রি, লুপ্ত স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান। এবং ধন্য ধরা :

স্বর্গের মর্ত্যের সকল ব্যবধান লুপ্ত সনাতন রাত্রে;
মৌনের নির্ঝর মেদুর সুরাসার সিঞ্চে গগনের পাত্রে;
জন্মাস্মর কার প্রণব সারিগান স্বপ্নাবেশে পিক গুঞ্জে;
প্রাক্তন পুষ্পের অমর অবদান স্ফূর্ত গোলাপের পুঞ্জে;

চন্দ্রের কৌস্তভ, উরসে প্রকৃতির, মুগ্ধ নিদ্রায় স্তব্ধ;
মৃত্যুর মঞ্জীর নীরবে শোনা যায়; শূন্যে মিশে যায় অব্দ;
সিদ্ধির নির্বাণ প্লাবিল মরধাম। কাজ কি অমরায় অন্য?
সুপ্তির সন্ধান দিয়েছে ভগবান; ধন্য, ধরা আজ ধন্য।

তৃতীয়াংশে জীবন-মৃত্যু অতিক্রান্ত প্রেম-সম্ভোগের অপূর্ব পরিতৃপ্তি :

মরণের সুধা সঞ্চিত তব আলিঙ্গনে;
জন্মান্তর নিমেষে ফুরায় ও-চুম্বনে;
তোমার নিবিড় নিঃশ্বাসবায়ু
করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু;
সন্নিধি তব সৃজন-আকূতি পরানে ভনে।
আসে তথাগতি তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে।।

এখানেই স্বপ্নলোক-বিহার সমাপ্ত। কবি স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে আসছেন। অন্তরে ক্ষুব্ধ হাহাকার নিয়ে :

> অকস্মাৎ স্বপ্ন গেল টুটে। দেখিলাম ত্রস্ত চোখে
> জনশূন্য রঙ্গালয়ে নির্বাপিত সমস্ত দেউটি,
> নিস্তব্ধ সকল যন্ত্র, মঞ্চ-'পরে যবনিকা ঢাকা।
> অলক্ষ্যে কখন পার্শ্ব হতে প্রেমিক-প্রেমিকা চ'লে
> গেছে অমৃতসংকেতে। শান্তি—শান্তি—শান্তি চারি ধারে।
> কেবল অন্তর মোর উত্তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হাহাকারে ।।
>
> (কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৫৪-৬৮)

এই শেষাংশে এসে স্তেফান মালার্মের 'ফনের দিবাস্বপ্নের' কথা চকিতে মনে পড়ে। ১৯৫৩ সালে 'অর্কেস্ট্রা'র ভূমিকা লেখার পর ঐ কবিতা তিনি অনুবাদ করেছিলেন এবং গদ্য-ভাষ্যে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত প্রসঙ্গে মালার্মের উচ্চারণ উল্লেখ করেছিলেন। গীতিনাট্য হিসেবে লিখলেও মালার্মের ঐ কবিতা গীত হয়নি।

"অর্কেস্ট্রা" অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ স্বকণ্ঠে রেকর্ড করেছিলেন। তাঁর আবৃত্তি আদর্শ বলা দুরূহ, তবু ঐ রেকর্ড শুনলে এই কবিতার শব্দ-সঙ্গীত ভেরেলিন-মালার্মে প্রার্থিত সমুন্নতি লাভ করেছে বলে মনে হয়। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এই নিরীক্ষা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত, সন্দেহ নেই।

'অর্কেস্ট্রা'র "নাম" (১৫ মে ১৯৩২) কবিতা শাশ্বত প্রেমানুভূতির পুনরুচ্চারণ :

> চাই, চাই, আজও চাই তোমারে কেবলই।
> আজও বলি,
> জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, আজও বলি—
> অভাবে তোমার
> অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,
> কাম্য শুধু স্থবির মরণ।
>
> (কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩৮)

সুধীন্দ্রনাথের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ক্রন্দসী' প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালে। ১৯২৮ সালের ৫টি, ১৯৩১ সালের ৩টি, ১৯৩২ সালের ৭টি, ১৯৩৩ সালের ৮টি ও তারিখবিহীন ১টি—মোট ২৪টি কবিতা এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, কালক্রমানুযায়ী কবিতাগুলো সাজানো হয়নি।

পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রার' "ভূমিকা"র প্রথম বাক্যে সুধীন্দ্রনাথ নিজেকে জড়বাদী বলে প্রচার করেছিলেন :

> পিতৃদেব ছিলেন নিশ্চিন্ত বৈদান্তিক; এবং আকৈশোর অদ্বৈতের অনির্বচনীয় আতিশয্যে উত্ত্যক্ত হয়ে, আমি যদিও অল্প বয়সেই অনেকান্ত জড়বাদের আশ্রয়

নিয়েছিলুম, তবু বিচারবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য আজও আমার অধিকারে এসেছে কিনা সন্দেহ। (কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩)

স্বভাবতঃই তাঁর ঈশ্বরচিন্তা বিবেচ্য হয়ে পড়ে—তিনি কি বিশ্বাস করেছিলেন ঈশ্বরের অস্তিত্বে? না কি তিনি ছিলেন নিরীশ্বর? ব্যক্তির আলোকে বিষয়টি বহুলাংশে আমার কাছে নিরর্থক। তবে কাব্য গ্রন্থের ভূমিকার দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ঐ প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

ঈশ্বর আছেন কি নেই—এই প্রশ্ন তিনি তুলেছিলেন 'ক্রন্দসী'র "প্রশ্ন" (১৮ জানুআরি ১৯৩২) কবিতায় :

ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই ?
নেই তুমি যথার্থ কি নেই ?
তুমি কি সত্যই
আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন ?
(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৯৮)

অবশেষে ইহলোক-পরাহত মানুষের পরলোকে 'জয়ে'র সম্ভাবনা সম্পর্কেও প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন কবি :

এ-নিষ্ঠুর অপচয়,
এর পাছে আছে অভিপ্রায়,
আছে কি আকূতি ?
হেথা যারা পরাজিত, বৈকুণ্ঠে তাদের হবে জয় ?
তোমার স্মারকস্তম্ভে অমর অক্ষরে
লেখা রবে তাহাদের নাম ?
নাম—শুধু নাম !
(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১০০)

কিন্তু ঐ কাব্যের "প্রার্থনা" কবিতা (১৭ জুন ১৯৩২) ঘনিষ্ঠ ভাবে পড়লে দেখা যায় : তিনি ঈশ্বর নয়, ধর্মব্যাসায়ীর বিরুদ্ধে তার তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করছেন। এক অর্থে এই তার সমাজচিন্তা বিষয়ক কবিতায় উত্তরণ : ঈশ্বরকে ধর্মচেতনায় নয়, জাগতিক লাভের উৎস হিসেবে যারা দেখে তাদের শঠতাই কবির আক্রমণের লক্ষ্য। জাগতিক মানুষের সকল জাগতিক মোক্ষ-লাভে সহায়তা করাই যেন বিধাতার একমাত্র কাজ। সুতরাং ঐ বিধাতা 'পৈত্রিক' এবং তার ভূমিকা 'আজ্ঞাবাহী দাসের' কবিতার শুরুতে :

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।

যেন পূর্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি, ক্রীত, পদানত
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডূকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।

এই মণ্ডূক কূপবাসী জনাকীর্ণ রাজপথে উদ্ধত দুর্বৃত্তের 'শক্তির উচ্চল পায়ে' অনায়াসে সাচ্ছন্দ্যে প্রণত হয় এবং বিপদ কাটলেই ঐ ঘটনাকে 'ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা' বলে প্রচার করে; এবং

এলে পরে লাভের সময়
সদসৎ-নির্বিচারে, সকলই তোমার দান ব'লে,
নিঃস্বের স্বেদাক্ত কড়ি হাতায়ে কৌশলে
আমিও জমাই যেন যক্ষসংরক্ষিত কোষাগারে।

এই নির্বিবেক তার সুসময়ে ভগবান বিস্মৃত; কিন্তু দুর্দিনে তার সহজ বিস্ময়:

দারুণ দুর্দিনে যেন পূজা মেনে বিস্ময়ে শুধাই,
"স্মরণে কি নাই,
"দয়াময়, আশ্রিতেরে স্মরণে কি নাই?"

সর্বোপরি সকল স্বার্থপরতা, শঠতা ও নির্লজ্জতার যাবতীয় জাগতিক সুখলাভের পর মৃত্যু হলে 'আজ্ঞাবাহী দাস' 'পৈত্রিক ভগবানের' প্রতি তার নির্দেশ:

আমার অন্তিম যাত্রা অতিক্রমি সুমেরুর বাধা
হয় যেন নন্দনে সমাধা,
যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা
সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃত মদিরা,
নীবিবন্ধ খুলে,
শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরুমূলে॥

(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১২৫-২৭)

সুতরাং এই কবিতা নিরীশ্বরতার নয়; এ কবিতার লক্ষ্য: সমাজের ভণ্ড ঈশ্বর-ব্যবসায়ী।

সমাজ-বিষয়ক ব্যঙ্গ "অকৃতজ্ঞ" (২৩ জুন ১৯৩৩) কবিতাতেও সুস্পষ্ট:

আমার মৃত্যুর দিনে কৌতূহলী প্রশ্ন করে যদি—
সাধিলাম কী সুকৃতি, হব যার প্রসাদে অমর?
মেনে নিও মুক্ত কণ্ঠে, নেই মোর পাপের অবধি;
সারা ইতিহাস খুঁজে মিলিবে না হেন স্বার্থপর॥

অজস্র ঐশ্বর্য মোরে অর্পিয়াছে সমুদার বিধি ;
ভুঞ্জেছি বিকুণ্ঠ মনে সে-সকলই প্রাপ্য ভেবে আমি ।
পেয়েছি অমিত্র সুধা আমন্থিয়া কালের বারিধি ;
করেছি তা আত্মসাৎ, শুধু বিষ কণ্ঠে গেছে থামি ॥

এই অকৃতজ্ঞ বিষকণ্ঠ বিশ্বনিন্দুক মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত দুশ্চরিত্র ; অনায়াসে সে উপকার গ্রহণ করে এবং পরমুহূর্তে উপকারীর কল্পকুৎসা রটনায় উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠে, কারণ পাছে উপকারীর কাছে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয়। এই অকৃতজ্ঞ বস্তুতঃপক্ষে সমাজজীবনে আবর্জনা এবং তার জীবনাবসান কারো জন্যেই শোকের নয় :

আমার মৃত্যুর দিনে তাই যদি অলস জিজ্ঞাসু
মাগে শবপরিচিতি, বিনা ভাষ্যে বোলো তারে, সখা,—
জগতের কোনও কাজে লাগেনি এ-অখ্যাত গতাসু,
যায়নি অনাথ ক'রে কোনও মৌন হৃদয়-অলকা ॥

(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৯২-৯৪)

উভয় কবিতায় উত্তম-পুরুষ ব্যবহারের ফলে ব্যঙ্গ সুতীব্র হয়েছে, সন্দেহ নেই। অবশ্য 'ক্রন্দসীর' "প্রতীক" (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩) শীর্ষক কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে ভিন্ন সুর :

ভিড়ের সংসর্গ মোরে করে সদা নৈঃসঙ্গ্যবিব্রত ॥

যদিও বলছেন :

তবু বিশ্বমানবেরে একমাত্র সত্য ব'লে জানি ;
... ...
'তাই মানুষের দিকে বারংবার মেলে দিই হাত ;

(কাব্যসংগ্রহ, পৃ.১০১)

তবে 'ক্রন্দসী'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিতা "উটপাখী" ; কবিতাটি তারিখবিহীন। উটপাখীর প্রতীকে সমকালকে বুঝে নিতে চাইছেন কবি। জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায় :

ডেকাডেন্ট যুগের প্রতীকী কাব্য, পুরোণো মূল্যবোধ ভেঙ্গে গেছে, নতুন মূল্যবোধ জাগেনি। ১৬

এই কবিতায় 'তুমি' 'আমি' বস্তুতঃপক্ষে কবিরই খণ্ডিত সত্তা। 'আমি' যখন 'তুমি'কে 'অসহায় একা' বলছে তখন যে-সমকাল 'আমি'র পটভূমি, 'তুমি'র পটভূমি তার থেকে ভিন্ন কিছু নয় :

কোথায় পলাবে ? ছুটবে বা আর কত ?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা ॥

এরপর সমকালের পরিবেশগত অসহায়তায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনিবার্যতার প্রতি 'তুমি'কে 'আমি' প্রবর্তনা দিচ্ছে, প্রবাদতুল্য উচ্চারণে :

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।

'তুমি'র উদ্দেশ্যে 'আমি'র প্রস্তাব 'তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো' এবং 'নব সংসার পাতি গে আবার চলো'। সেই 'নব সংসারের' প্রতিশ্রুতিতে কি হবে, কি হবেনা তার তালিকা :

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলব না লোহার চিড়িয়াখানা;
ডেকে আনব না হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।
ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি,
শ্রমণশোভন বীজন বানাব তাতে;
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি
পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজব না অমারাতে।
তোমার নিবিদে বাজাব না ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে;
সে-পাড়া-জুড়নো বুলবুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে উন্নতিরেশ ॥

তৃতীয় ও শেষ স্তবকের প্রথম চার চরণে 'তুমি' ও 'আমি'র অবস্থান যে একই সমতলে তার স্বীকৃতি :

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দু'জনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।

পরবর্তী চার চরণে 'আমি'-র সঙ্গে সন্ধির অনিবার্যতা 'তুমি'কে বোঝাবার প্রয়াস। প্রতিটি চরণই পূর্ণ বাক্য : একটি উপলব্ধি, একটি প্রশ্ন ও দুটি উপদেশ :

তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।

শেষ চার চরণে 'অতএব' চিহ্নিত সিদ্ধান্তে প্রত্যুপকার-প্রতিশ্রুত উপসংহার :

অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি :
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি ॥
(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৭৩-৭৪)

'তুমি' 'আমি'কে লোকোত্তরে নিয়ে যাবে এবং 'আমি' 'তুমি'কে লোকায়তে বাঁধবে— এই সম্ভাবনার শর্তে 'সন্ধি'র মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে 'প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ' সিদ্ধির মত মধ্যবিত্তের 'সংগতি'[১৭] প্রত্যাশা ধ্বনিত হচ্ছে। স্পষ্টতঃই এই সিদ্ধি, এই সঙ্গতি সুবিধাজনক। স্মর্তব্য কেবল জীবনানন্দের সতর্কবাণী : 'সকলি সুবিধা হতে গিয়ে তবু প্রধূমায়মান'[১৮]।

"সন্ধান" শীর্ষক কবিতায় কবির প্রত্যাশা কি তা কবি বলছেন :

আমি যারে চাই
তার মাঝে ভেদ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, দেশ-কাল নাই ;
মননে ও মনীষায়, দেহে ও বুদ্ধিতে
একান্ত সে ; বিসংবাদী উপাদান শিল্পের শুদ্ধিতে
যেমন নিষ্ফল, সেও তেমনই সংগত—
সংকল্পপ্রহত
বাদ্যভাণ্ড মগ্ন ঐকতানে ; (কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৭৫)

পরবর্তী কাব্য গ্রন্থ 'উত্তরফাল্গুনী' ১৩৪৭ সনে (১৯৪০) প্রকাশিত হয়। সংকলিত ১৯টি কবিতার প্রথম ও শেষটি তারিখবিহীন, দুটি ১৯৩২ সালের এবং ১৫টি ১৯৩৩ সালের রচনা।

কবি বলতে চান 'মর্ত্যের সূচ্যগ্র কোণ একমাত্র অন্বিষ্ট আমার' (মাধবী পূর্ণিমা, কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৬১) —কিন্তু বলা হয়না ('কেমনে তাদের বলি')। কবির 'সংশয়'— 'রূপসী' নয় আবার 'কুরূপা'ও নয় এমন কারো প্রেমে কি তার 'বিজ্ঞ হিয়া' ধরা পড়েছে ?

ভালো কি তবে বেসেছি তারে আমি ?
বিজ্ঞ হিয়া শিহরে তাই ভয়ে ?
("সংশয়", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৩৬)

'বিজ্ঞ হিয়ার' এই প্রেম-ভীতিতে যে এন্টি-রোমান্টিকতা তারই ভিন্ন উচ্চারণ "নিরুক্তি"তে (৮ এপ্রিল ১৯৩৩) :

মিলনে ক্ষুধা মিটেনি কোনও কালে ;
কামনা শেষে মিশেছে এসে কামে।

অন্ধ আশা রুদ্র বিরহেরে
ভাববিলাসী করেছে পরিণামে ।।
(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৪৩)

কবিতাটির শেষ পর্যায়ে অবশ্য প্রেমের অসম্পূর্ণতা মেনে নেবার ইচ্ছে প্রকাশিত :

তথাপি মিছে আত্মসমাহিতি ;
নিরাসক্তি আসক্তিরই ভেক ;
নাস্তি যার পৃষ্ঠে, পুরোভাগে,
সমান তার বিবেক, অবিবেক ।।

আত্মা সদা স্বগত, একা বটে,
তাই কি হেয় দেহের পরিচিতি ?
থাক না তাতে তৃষিত অচিরতা,
বাকি যা-কিছু সবই যে অনুমিতি ।।
(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৪৪)

এই উপসংহারের পরিণামে পরবর্তী কবিতায় ("মৌনব্রত", ১৬ এপ্রিল ১৯৩৩) প্রেমের গভীর রোমান্টিক অনুভব আবিষ্কার করছে 'সংক্ষিপ্ত ভাষার শক্তি'। রোমান্টিকতার পরিপূর্ণ আচছন্নতার মধ্যে সকল এন্টি-রোমান্টিক যুক্তিকাল অর্থহীন জঞ্জাল বলে মনে হচেছ :

আজি ধূলা ঝেড়ে ঝেড়ে, পুরাতন পুঁথি খুঁজে দেখি
রচিলাম যত গান, সে-সকলই মিছে আর মেকী,
নিরুদ্দিষ্ট অতিকথা, নিরর্থক বাক্যের জঞ্জাল ।

রচিত সকল 'প্রতীকের পরমার্থ', 'উপমার অন্তর্দীপ্তি', 'উৎপ্রেক্ষার নিগূঢ় আকৃতি' তাই অর্থহীন এবং বিস্ময় :

কেমনে এখন ভাবি কোনও চিরসুন্দরের দূতী
পেয়েছিল এক দিন অসংবদ্ধ এই ধ্বংসস্তূপে
অমর আত্মার সাড়া ; উচচকিত প্রতি রোমকূপে
অকস্মাৎ জেগেছিল প্রাণদ, প্রণব প্রতিধ্বনি
এ-বিলগ্ন শব্দচয়ে ; অন্ধ অবচেতনার খনি
বৈদ্যুতিক ব্যঞ্জনায় হয়েছিল ক্ষণেক ভাস্বর ?

প্রেমের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশের সীমাবদ্ধতা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে :

নৈরাশ্যের নিরুদ্দেশে হারায় কি তাই কণ্ঠস্বর
যখনই বলিতে চাই আত্মকথা তোমারে, সুন্দরী ?

তোমার অগাধ দৃষ্টি থামে যেই মোর মুখোপরি
সনির্বন্ধ জিজ্ঞাসায়, তৎক্ষণাৎ বুঝি মনে মনে
এ-বারেও যা গাহিব, যাযাবর কালের লুণ্ঠনে
অনর্থক প্রলাপে তা অচিরাৎ হবে পরিণত।

তাই সিদ্ধান্ত :

· · 'তার চেয়ে তোমার আননে
এমনই অবাক চোখে চেয়ে থাকা শতবার শ্রেয় ॥
সংক্ষিপ্ত ভাষার শক্তি, নীরবতা, অক্ষয়, অমেয় ॥
(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৪২)

নীরবতায় পৌঁছবার আগের এই সরব পংক্তিমালা নিঃসন্দেহে এক গভীর রোমান্টিক প্রেমিক কবিকে চিনিয়ে দেয়।

"ব্যবধান" কবিতায় (২ মে ১৯৩৩) 'শাপভ্রষ্ট কে এক উর্বশী'-র 'অনির্বচনীয় তনু' সম্ভোগের স্মৃতিক্লিষ্ট-কবি দয়িতাকে বলেন—'সে-দিব্য মিলনে তুমি অধিকার দাওনি আমারে' ("ব্যবধান", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৩৭)। তাই ফিরে যান একাকিত্বের চৈতন্যে : 'মনে হয় একা আমি' ("অহৈতুকী", ১২ জুলাই ১৯৩৩, কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৪৫)। তবু সাফল্য-প্রয়াসে অবিরাম কবি পুনরায় হাত বাড়ান :

সর্বহারার দুর্গম পথে
নিয়ামক বিনা যায় না যাওয়া ॥
তবু পরিহরি বিত্তের মোহ
রিক্ত অয়নে দাঁড়াও নেমে।
তোমার ত্যাগের দাম ধ'রে দেব
অনির্বচন অমর প্রেমে ;
নিয়ে যাব যেথা নেই দেশ-কাল,
নেই ব্যাধি-জরা, ক্ষয়-জঞ্জাল,
সত্য যেখানে স্বপ্নসুষমা,
ভেদ নেই যেথা সীমায় হেমে।
স্বার্থপরের অর্ঘ্যের লোভ
ত্যাগ ক'রে এসো নিভৃতে নেমে ॥
("প্রতিদান", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৪০-৪১)

মনে হয়, কবি যেন বলতে চান : তাঁর দয়িতার সহযোগিতাহীনতায়ই তাঁর প্রেম নিষ্ফল হচ্ছে :

আমার প্রেমের অর্ঘ্যপ্রদানে
অপারগ সেও, জানি ;

আমিও বুঝি না সে-মূক নয়ানে
লিখিত কী গূঢ় বাণী ॥

এই পরিস্থিতিতে কবির কাছে 'নিরুদ্দেশের অমা'-ই 'মঙ্গলময়', সুতরাং তাঁর আকূতি :

পরিবৃত করি মহাসংকটে
তুলে নাও, সখা, নায়ে ॥
("মরণতরণী", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৪৬)

পরদিন (১ অগস্ট ১৯৩৩) রচিত "দুঃসময়" কবিতার উপসংহারেও মৃত্যু-পরবর্তী উত্তরণের প্রত্যাশা ধ্বনিত হয়েছে। সূচনাতেই ছিল 'দৈব দুর্বিপাক' :

মোদের সাক্ষাৎ হল অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়,
সমুদ্যত দৈবদুর্বিপাকে।—

সেখানে 'অবোধ স্বপন' সত্য হলেও, 'ঈর্ষাপর ক্লীবের সমাজ' 'মার্জনা করলেও' পরিণামে অনিবার্য নিষ্ফলতা, কারণ :

—আমাদেরই দুর্নর অতীত
অতর্কিত ভূকম্পনে বিনাশিবে বিশ্বাসের ভিত ;

যেহেতু 'ফেরার পথ বন্ধ হয়ে' গেলেও 'কায়-মনে তোমারেই চাই'—তাই কবি অবশিষ্ট মাত্র : 'মৃত্যু মাধুরী'তে 'অমরা' সাজাতে চান ; তাঁর বিশ্বাস :

নবজাত ভগবান বিরচিবে কৃতজ্ঞ উল্লাসে
আমাদের নব নীহারিকা ॥
("দুঃসময়", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৫২)

প্রেম-মৃত্যু প্রাসঙ্গিক এ-পর্যায়ের শ্রেষ্ঠতম কবিতা "মহানিশা" (৩ অগস্ট ১৯৩৩)। দ্বিতীয় ও অষ্টম চরণে ৬/২ এবং অন্যান্য চরণে ৬/৬/২ মাত্রাবৃত্তের কখ কখ গগ গখ কখ মিলবিন্যাস রীতির অনুরূপ দশ চরণের চারটি স্তবকে রচিত এই মিতভাষী কবিতা সুধীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত রোমান্টিক কবিচিত্তের অসামান্য পরিচয়বহ। মিলনের মুহূর্তেই কবি মৃত্যু কামনা করেছেন। প্রথম স্তবকে পরিবেশ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সফলতার, বিধাতা কর্তৃক চিরজনমের ঋণ পরিশোধের স্বীকৃতি :

মরণ, তুমি তো আসিবেই এক দিন,
এসো তবে আজ বেগে।
দশমীর চাঁদ আকাশে তন্দ্রাহীন
ভর ক'রে আছে বীতবর্ষণ মেঘে ;
সুদূরের হাওয়া কোথা নারিকেলবনে
কার আহ্বান নিবিদ ভাষায় ভণে ;

রজনীগন্ধা রয়েছে কি প্রয়োজনে
প্রচুর পরাগে জেগে ;
শুধেছে বিধাতা চিরজীবনের ঋণ ;
এসো,' হে মরণ, এসো আজ দ্রুত বেগে ॥

দ্বিতীয় স্তবকে মিলনের সদ্যস্মৃতি, মিলনের পূর্ণতার মধ্যেই কবি দেখছেন জীবনের পূর্ণতা—মৃত্যুর ছায়া :

আজি প্রেয়সীর সুরভিনিবিড় কেশে
দেখেছি তোমার ছায়া ;
চিনেছি যে তার অযাচিত আশ্লেষে
কত বিমোহন তব বিরতির মায়া ।
এখনও শ্রবণে ধ্বনিতেছে অবিকার
গাঢ় কণ্ঠের নিরুপাধি ঝংকার ;
স্মৃতিসঞ্চিত ঘন চুম্বনে তার
এখনও শিহরে কায়া ;
এখনও জগৎ লুটে মোর পাদদেশে ;
ঘনাও, মরণ, এই বেলা তব ছায়া ॥

তৃতীয় স্তবকে নাটকীয় সংশয় : মিলনানন্দ কি স্বপ্ন ? সকালে কি তা হয়ে উঠবে অনুশোচনার উৎস ? :

কি জানি, হয়তো, কেবলই স্বপন দেখি,
ফুরাবে সকলই প্রাতে ।
প্রগল্‌ভ পণ অনাহত রহিবে কি
প্রতিদিবসের প্রচণ্ড সংঘাতে ?
দেবদুহিতার ধূলামাখা খেলাঘরে
ভাঙা পুত্তলি প'ড়ে রব অনাদরে,
তবু লোভী কাল দৈব কোপের ডরে
লবে না আমারে হাতে ।
মদির নিশায় ভিক্ষুরে অভিষেকি,
অনুশোচনায় জ্বলিবে না সে কি প্রাতে ?

এই সংশয় দুঃসহ ; সুতরাং, চতুর্থ স্তবকে অমোঘ সিদ্ধান্ত :

তার চেয়ে ভালো আজি তব রসায়নে
আদি ভূতে ফিরে যাওয়া,
শুক্ল শশীর শাশ্বত বিকিরণে
খোলা বাতায়নে সুপ্ত সে-মুখে চাওয়া,

মৃদুল মলয়ে বরতনুখানি ঘিরে
কম্র কামোদে কামনা জানানো ধীরে,
ধূলিরেণু হয়ে ঢেকে সারা পৃথিবীরে
তারণ চরণ পাওয়া,
ঈর্ষা জাগায়ে পুরূরবাদের মনে
এ-মহানিশায় সনাতনে মিশে যাওয়া ॥

(কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৫৭-৫৯)

'উত্তরফাল্গুনী'র একযুগ পরে প্রকাশিত হয় 'সংবর্ত', ১৯৩৮-৫৩ সালের মধ্যে রচিত কবিতা, সেই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে ৭টি ১৯৩০-৩৪ সালের পুনর্লিখিত রচনা, যাকে 'কৈশোরক' বলা কোনক্রমেই ঠিক হয়নি।

নীরবতার এই এক যুগ সুধীন্দ্রনাথের জীবনে কঠিন সংকটের কাল। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের শেষে তিনি থেকে গিয়েছিলেন ইউরোপে। মার্কসবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ফেরার পথে জার্মানীতে ফ্যাসীবাদীদের হাতে লাঞ্ছনা [১৯] তাঁকে করে তুলেছিল ফ্যাসী-বিরোধী। দেশে ফিরে প্রকাশ করেছিলেন প্রগতিশীল বন্ধুদের সঙ্গে 'পরিচয়'; ১২ বৎসর সম্পাদক ছিলেন ঐ অসামান্য পত্রিকার। তারপর সংশ্রব ছিন্ন করেন নিজেই। ১৯৩৮ থেকেই মার্কসবাদ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করতে শুরু করেন। যেমন।

১৯৩৮ আজকাল অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে যে মার্কস হয়ত হেগেলকে ঠিক পায়ের ওপর দাঁড় করাতে পারেননি, বরং সেই চেষ্টায় আপনি উল্টে পড়েছিলেন; এবং সম্ভবতঃ সেই জন্যে তিনি বুঝেননি যে জগতে সত্যই যদি ডায়ালেকটিক ঘটে, তবে তার গতি বিরোধ থেকে সমন্বয়ে, অথবা দুই থেকে একে নয়, তার গতি অখণ্ড থেকে খণ্ডে, শৃঙ্খলা থেকে সংঘাতে, স্বভাব থেকে অভাবে। অর্থাৎ যে-নিয়মে জীবকোষ নিরন্তর বাড়তে পায় না, একটা প্রাক্‌নির্দিষ্ট অবস্থায় পৌঁছে দু'ভাগে ভেঙে পড়ে, সেই বিধির অনুসারেই জাতি তথা ব্যক্তি প্রাথমিক একাগ্রতা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত বুদ্ধির জন্ম দেয়; এবং সেই দ্বন্দ্বের দোষে জাতির বর্ণাশ্রম যেমন শ্রেণী সংঘর্ষে বদলায়, তেমনি ব্যক্তির বিশেষতঃ শিল্পী-ব্যক্তির ক্ষেত্রে কল্পনা হারায় সংকল্পে। [২০]

১৯৩৮ জনসাধারণকে একছাঁচে ফেলে সাজালেও, যখন দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘোচবার নয়, তখন আত্মম্ভরিতার চেয়ে আত্মচিন্তাই বেশি লাভজনক। এবং প্রতিবেশীর উপর গায়ের জোর ফলিয়ে তাকে যদিও দাবানো যায়, তবু তার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত আপন স্বায়ত্তশাসনের আশা বিড়ম্বনা। আমার বিশ্বাস সাযুজ্য নয়, তাই দ্বৈত বোধেই সাম্যবাদের উৎপত্তি এবং যে-মানুষ সত্যই নিজেকে চেনে, তার কাছে যেমন স্বীয় ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট তেমনিই সঙ্গে সঙ্গে সে এ-জ্ঞানেও বঞ্চিত নয় যে, জীবমাত্রই বৈশেষিক বলে তার বৈশিষ্ট্যও অবশ্য স্বীকার্য : [২১]

১৯৫৭ শাস্ত্র-এর মতোই আমি একদা ভাবতুম যে মনুষ্যধর্মের শাশ্বত সমস্যা মার্কসীয় ডায়ালেকটিকে সমাধানসাধ্য। তবু বামাচারের উদ্দেশ্য ও উপায়ের বৈপরীত্য তখনও আমাকে দুঃখ দিত এবং বরাবরই আমার সন্দেহ ছিল যে সে-বিরোধের শেষ নেই। অন্ততঃপক্ষে আমি অবিলম্বে বুঝেছিলুম যে শ্রেণী-সংঘর্ষের সতঃসিদ্ধি একবার মানলে ভাববিলাসই শ্রমিক জগতে আমার একমাত্র প্রবেশপথ; এবং সেইজন্য আমি সর্বদা জানতে চাইতুম সাম্যবাদে অবনতের উন্নতি যেমন অবশ্যম্ভাবী, উন্নতের অবনতিও তেমনই অনিবার্য কিনা।[২২]

১৯৪১ সালে সুধীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে। তার সঙ্গে প্রকাশ করেন 'মার্কসীয়ান ওয়ে' পত্রিকা। পরে এই পত্রিকার নাম পাল্টে রাখা হয় 'হিউম্যানিস্ট ওয়ে'। এম. এন. রায়ের সঙ্গে পত্রালাপে কালের সংকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

১৯৪৪ সালে (জানুয়ারী ১২) মানবেন্দ্রনাথ রায়কে লেখা চিঠি :

সি. পি. আই. দলে আমার প্রাক্তন-বন্ধুদের বক্তব্য অনুসারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পশ্চাৎমুখীন। এটা খুব কম বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ঐসব 'প্রগতিশীল' সমাবেশে 'বাঁধন ছিঁড়ে বেরুতে চায়' তখন যুবকদের চেয়ে আপনার মত মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে আমি অনেক বেশি সজীবতা দেখতে পাই।

১৯৪৫ সালে (ফেব্রুয়ারী ২১) তারিখে এম. এন. রায়কে লেখা চিঠি :

আমার বরাবরই 'মার্কসীয়ান ওয়ে' নামটি পছন্দ।…

আইয়ুব (আবু সায়ীদ আইয়ুব) সৌন্দর্যতত্ত্ব অথবা মার্কসবাদের নিন্দামূলক একটা প্রবন্ধ লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখন অসুস্থ।…
আমার নিজের লেখাটাও (রেট্রোস্পেক্ট : 'মার্কসীয়ান ওয়ে' প্রথম সংখ্যা) তৈরী।… লেখাটি আদৌ আমার মনোমত হয়নি। কাজেই আপনার অপছন্দ হলে ওটাকে বাতিল করতে দ্বিধা করবেন না। আমার নিজের লেখা সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা কিন্তু আমার অসংখ্য ত্রুটির মধ্যে একটিও নয়।

এইমাত্র আমি ডিউই'র বইটা (ফ্রীডম এণ্ড কালচার) শেষ করলাম। বইটি আমার ভাল লেগেছে। কারণ বইটির রুশবাদ বিরোধিতা আমার মতই তীব্র। ডিউই আমার মতই একনায়কত্ব বিরোধী, বহু জিনিসের মধ্যে ভালো দেখেন।

১৯৪৭ (জুলাই ১৪) তারিখে এম. এন. রায়কে লেখা চিঠি :

আমি নিশ্চয়ই একজন বস্তুবাদী। কিন্তু আপনার মতো আমিও স্বীকার করতে বাধ্য যে, জ্ঞানের লক্ষ্যকে বর্ণনা করার যুক্তি-ভিত্তিক অসুবিধা এড়িয়ে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু এ-কথার অর্থ এই নয় যে, আমাদের সকলকে প্রপঞ্চবাদী হতে হবে।…

এই শহরের (কলকাতা) বর্তমান পরিবেশ (হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা) চিন্তা-ভাবনা করতে সাহায্য করে না।

অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে আমার সমালোচনায় আমি খুশি হইনি। কিন্তু নূতন মতবাদ কি বলতে চায়, তা অনুধাবন করা এতই কঠিন যে, খুটি-নাটি বর্ণনা করা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। আমি অবশ্য তারপর নিজের দর্শনের সপক্ষে শাস্ত্রের লেখা পড়েছি, যেখানে তিনি কৌশলের সঙ্গে অস্তিত্ববাদকে কারর্লেসিয়ান ইজমের সমপর্যায়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। অগত্যা তাদের অবস্থা প্রায় ত্রিশঙ্কুর মত: তারা স্বদেশে উন্মুক্ত, অথচ বিদেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারে না এবং সেই জন্যে তাঁদের অব্যক্ত অনুশোচনা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি নিষ্ফল।[২৩]

১৯৪৬ সালের (৭ই জুলাই) এম. এন. রায়কে লেখেন:

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে তাঁর (ধূর্জটী) মতামতের সঙ্গে আমি একমত। এঁরা ফাঁপা মানুষ, কোথাও এঁদের শিকড় নেই, অবশ্য আমি যদি নিজেকে দিয়ে বিচার করি এবং আমাকে যদি তাঁদের একজন বলে ভাবি। আমি নিজেকে নিয়ে সেই ভাবেই চিন্তা করি। যে-কোন কারণেই হোক, আমরা ভারতের বিশেষ ইতিহাসের অংশ নই।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য তাঁর 'সংবর্ত' এবং 'দশমী' কাব্যের পরিবেশ, দেশ ও বিশ্ব-সচেতন মিতভাষী পংক্তিসমূহ। তাঁর উচচারণে উপস্থাপিত প্রত্যয়হীন বুদ্ধিজীবীর বিমূঢ় সমকাল-প্রভা ।

যুদ্ধমাত্রই অমানবিক। তবু স্মর্তব্য, প্রথম মহাযুদ্ধে পৃথিবী থেকে বড় বড় সাম্রাজ্য মুছে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তারপরে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার অসংখ্য দেশ। সেই সঙ্গে বিশ্ব বিভক্ত হয়েছে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরে এবং আবার একই শিবিরে অল্পকালের মধ্যেই দেখা গেছে অসংখ্য ফাটল ও ছোট ছোট জোট; এবং জোটনিরপেক্ষতার তত্ত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর এই চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে সুধীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের কোন ভিত খুঁজে পাচেছন না:

ক. তবু জানি যবে জয় হবে বলেছিলে,
চাওনি তখন তুমিও এ-পরিণাম:
শূন্যে ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে,
ক্লান্তির মতো, শান্তিও অনিকাম।
এরই আয়োজন অর্ধশতক ধ'রে,
দু-দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে;
কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে,
মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে!
নির্বাণ নভে গৃধ্নু রাহুর গ্রাস;

তুমি অনিকেত নির্বাক নাস্তিতে :
কে জবাব দেবে, নিখিল সর্বনাশ
কোন্ অবরোহী পাতকের শাস্তিতে ?
("১৯৪৫" : ৬, কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৯৯-২০০)

খ. অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই :
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই ;
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে,
জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে
তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি ?
("প্রতীক্ষা", কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩১২)

'দশমী'র শেষ কবিতা "নষ্ট নীড়" কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিজীবনেরই উপসংহার-স্বরূপ। "মানবজীবনের শাশ্বত নিয়তি, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের প্রতি আসক্তি, মর্মান্তিক ব্যর্থতার ট্র্যাজিক আবহ, প্রৌঢ় অভিজ্ঞতার অনবদ্য কাব্যরূপ"[২৪] :

কৃষ্ণচূড়া নিষেধে মাথা নাড়ে,
কুলায় খোঁজে শুক :
চৈত্রশেষ সূচিত হাড়ে হাড়ে,
সূর্য অধোমুখ।
কেবলই দূর মুখর তবু পবনে,
কোথায় যেন নিবিদ বলে যবনে ;
চিরায়মাণ নির্বাপিত হবনে
কালের কৌতুক।
বিরত মহাশূন্য ওই গোধূলি ধীরে ঝাড়ে :
কৃষ্ণচূড়া তাড়ায়, ওড়ে শুক ।।

কখন ওঠে, পাতালভেদ ক'রে,
অসম্ভূত অমা :
বায়ুর বেগ সহসা যায় ম'রে ;
দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা।
জ্যোতির্গামী কিন্তু সেই তমসও,
তারার ফেনা উৎসারিত ক্রমশ ;
মৌনে পড়ে তীর্থামৃত লোমশও,
স্বয়ংবর প্রমা।
তাহলে কেন বিরহী শুক নিরুদ্দেশে ঘোরে,
মজায় কাকে অনাত্মীয় অমা ?
("নষ্ট নীড়", পৃ. ৩২১-২২)

এই কবিতা ও এই কাব্য প্রসঙ্গে এক পত্রে কবি বলেন :

> দেশ, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে আমার অন্যান্য বিরোধী মতামতের ঐক্যসাধনের প্রয়াস পেয়েছি 'দশমী'-তে। ··· আমার বিশ্বাস জীবন মরণে পূর্ণ এবং মৃত্যুর সামনে না আসা পর্যন্ত ব্যক্তি আপনার স্বরূপ চেনে না।···
>
> তবে উপলব্ধিটা বাস্তব—অর্থাৎ কবিতা লেখার জন্য গৃহীত নয় বরঞ্চ এতবার এত রকমে ওটার কবলে পড়েছি যে ওকে আমার লেখা থেকে ছেঁটে ফেলা অসম্ভব। এবং তর্কের দ্বারা বিপ্রলাপের প্রতিপাদন অসাধ্য ব'লেই 'দশমী'-তে চিত্রকল্পের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত অধিক।[২৫]

সুধীন্দ্রনাথের প্রতীক ও শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে ডক্টর দীপ্তি ত্রিপাঠী মালার্মে ও ভালেরির কবিতা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তা উপাদেয় সন্দেহ নেই কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ যেহেতু কদাচ জীবনানন্দ দাশ কি বিষ্ণু দে-র মতো পাশ্চাত্ত্য পুরাণ কি প্রতীক ব্যবহার করেন, সেহেতু ঐ আলোচনার বহুলাংশই বাহুল্য। সুধীন্দ্রনাথের শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে আমি আগেই আলোচনা করেছি। তিনি ঠিক অডেনের মত 'বাইবেল' কি 'আন ব্যাবারিজড্ অক্সফোর্ড ডিকশনারী'র দুরূহ শব্দ খুঁজে খুঁজে ব্যবহার করেননা। এবং তার কবিতা বিষ্ণুদের তুলনায় যে দুরূহ নয় তা বলাই বাহুল্য। বুদ্ধদেব বসুকে একবার এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : "ছন্দপতনের ভয়ে ব্যাকরণের অপমান অমার্জনীয়।"[২৬] এই মন্তব্যের কয়েকদিন পরই কবিতার ভাষা ও ছন্দ প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন :

> যে লেখা সাধারণবোধ্য নয় তার কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু লিখতে গেলেই আমি একটা প্রচণ্ড বাধা অনুভব করি এবং সেই বাধা কাটিয়ে উঠতে আমার সমস্ত শক্তি খরচ হয়ে যায়; দুরূহতা অতিক্রম করা আর সাধ্যে কুলায় না। সেই জন্যই আমি এত কম লিখি এবং লেখা শেষ করে সাধারণ লেখক যে আরাম পান, তা আমার কপালে জোটে না। তবু চেষ্টার আমি বিমুখ নই এবং ইতিমধ্যে প্রবর্তন যদি একেবারে না ফুরোয়; তাহলে কোন একদিন হয়ত সরল রচনা আমার কলম দিয়েও বেরোবে।[২৭]

এই হচ্ছেন সুধীন্দ্রনাথ। আপন পরিশ্রমে বিরূপ বিশ্বে ভাষা ও ছন্দ নির্মাণে অপরূপ উত্তরণের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি। হয়ত মানবিক পরিত্রাণের পথ অনুসন্ধানে তিনি শেষ পর্যন্ত ত্রিশঙ্কু, পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে। তবু স্মরণীয়, কোন প্রত্যয়কেই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। যুগে যুগে প্রচারিত প্রতিটি প্রত্যয়ই যে দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবনযোগ্য এবং উত্তরকালেও দেশকালের ও ব্যক্তি-মনীষার নিকটে পুনর্বিবেচনাযোগ্য—এই আধুনিক চৈতন্যের প্রকৃত ধারক তিনি : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

তথ্যনির্দেশ

১ "যযাতি", 'সংবর্ত', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৬২ ; নাভানা, কলিকাতা, পৃ. ২০২-০৩

২ Quest, July-Sept. 1960

৩ জগদীশ ভট্টাচার্য, 'কবি ও কবিতা' ২ : ১, ১৩৭৩, পৃ. ১২০

৪ 'জীবনীপঞ্জি', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৩৯৫

৫ রচনাকাল : ১৪ জুন ১৯২৫

৬ জগদীশ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত।

৭ জীবনানন্দ দাশ, "কয়েকটি চরণ", 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'।

৮ তুলনীয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "১৪০০ সাল" কবিতা।

৯ প্রথম চরণ : 'তন্বী সে যে', রচনাকাল : ৯ই মার্চ ১৯৩০

১০ নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত 'সুধীন্দ্রনাথ', পৃ. ২৩৭-৩৯

১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অতিবাদ", 'ক্ষণিকা'।

১২ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, "ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ", 'কুলায় ও কালপুরুষ', পৃ. ৪৮

১৩ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, "রবিশস্য", 'কুলায় ও কালপুরুষ', পৃ. ২৪

১৪ বিষ্ণু দে, 'উর্বশী ও আর্টেমিস', পৃ. ২৯

১৫ Brereton, 'A short History of French Literature', p. 29

১৬ জগদীশ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত

১৭ তুলনীয় : অমিয় চক্রবর্তী, "সংগতি", 'অভিজ্ঞান বসন্তে' (১৩৫০)

১৮ জীবনানন্দ দাশ, "ভাষিত", 'সাতটি তারার তিমির'

১৯ নিরঞ্জন হালদার, পূর্বোক্ত

২০ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'কুলায় ও কালপুরুষ', পৃ. ২৬৮

২১ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০

২২ পূর্বোক্ত

২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২৪ জগদীশ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত

২৫ 'দশমী' সম্পর্কে ১২ই জুন ১৯৫৬ সালে লেখা কয়েকটি চিঠি দ্রষ্টব্য।

২৬ বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি ১৯৪৬ সালের ১১ই এপ্রিল।

২৭ বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি ১৯৪৬ সালের ১৫ই এপ্রিল।